সংগ্রামের ফলে মহামারী দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি জগত হইতে বিদূরিত হইয়া সুভিক্ষ প্রতিষ্ঠিত হইবে, দিকসকল প্রসন্ন হইবে, নদী সকল মধুক্ষরণ করিবে, ওষধিবনস্পতি সকল ফলবান হইবে, সেই সংগ্রামই আমাদের সংগ্রাম। আমরা সেই সংগ্রামেই অবতীর্ণ হইবার জন্য সকলকে আহ্বান করিতেছি। এই আহ্বান তোমার আমার আহ্বান নহে—তোমার আমার মুখ দিয়া ভগবানেরই আদেশ বিনির্গত হইতেছে। তাঁহার আদেশ আসিয়াছে, তাই আজ দিকে দিকে তাঁহার নামের বিজয়ভেরী বাজিয়া উঠিতেছে; অধর্ম্ম স্বীয় শতবিধ সহচর অত্যাচার অনাচার প্রভৃতির সাহায্যে নিজের জয়ঢাক বাজাইতে থাকিলেও ধীর, স্থির ও দৃঢ় পদক্ষেপে ধর্ম্মের অজেয় বাহিনী সিংহবিক্রমে ভগবানের নামে বিশ্বজয়ে বাহির হইয়াছে।

এই সংগ্রামে লক্ষ লক্ষ নরহত্যার কোনই অবসর না থাকিলেও ইহা বড় সহজ সংগ্রাম নহে। যে সংগ্রামে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে ক্ষুদ্রজনোচিত তুচ্ছ হৃদয়দৌর্ব্বল্য ঝাড়িয়া ফেলিয়া বীরবিক্রমে অগ্রসর হইবার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন, ইহা সেই সংগ্রাম। এই সংগ্রামে এক-আধদিন নয়, এক-আধ বৎসর নয়, অনন্তকাল ধরিয়া তিলে তিলে আত্মবলি দিতে হইবে। আমাদের অনন্ত জীবনের যে বিশাল অংশ সম্মুখে বিস্তৃত পড়িয়া আছে, এই সংগ্রাম সেই অনন্তকালব্যাপী জীবনমরণের সংগ্রাম। ভুলভ্রান্তি যাহা কিছু করিয়াছি, পাপতাপ যাহা কিছু করিয়াছি, অতীতে মলিনতা যত কিছু মাখিয়াছি, সে সমস্ত পশ্চাতে ফেলিয়া রাখিয়া সম্মুখের এই সুবিস্তৃত জীবনকালের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সর্ব্ববিধ অবনতির সহিত সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়া সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির পথে, সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গলের পথে অগ্রসর হইতে হইবে। বাঁচিতে যদি চাই, তবে এই অনন্ত সংগ্রামে আমাদিগকে নামিতেই হইবে। এই সংগ্রামে জয়লাভ কর—বাহিরের সংগ্রামেও জয়লাভ হস্তগত। এই সংগ্রামে জয়লাভ কর,—সর্ব্ববিধ স্বরাজ তোমার হস্তগত হইবে; স্বাধীনতা অযাচিতভাবে তোমার নিকটে আসিয়া ধরা দিবে। এই সংগ্রামে যদি মৃত্যুও হয়, তবে সেই মৃত্যুই তোমাকে ত্রিভুবনবিজয়ী করিবে।

ধর্ম্মের নামে, স্বদেশের নামে বা অন্য যে কোন উদ্দেশ্যেই হৌক, উচ্ছ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া সহসা একবার প্রাণ দেওয়া সহজ, কিন্তু ধর্ম্মাধর্ম্মের সংগ্রামে, শ্রেয়-প্রেয়ের সংগ্রামে তিলে তিলে পলেপলে আত্মবলিদান যে কত দুরূহ, তাহা এই পথের পথিক যাঁহারা, তাঁহারাই উপলব্ধি করিয়াছেন। একদিকে সংসারের সুখবৃদ্ধি, মান-ঐশ্বর্য্য, বিলাস-কৌতুক প্রভৃতি প্রেয়ের শতবিধ উপকরণ সবলে আকর্ষণ করিতেছে; অপরদিকে ধর্ম্মের মঙ্গলভাব, শান্তি প্রভৃতি শ্রেয়ের উপকরণ সুদৃঢ়ভাবে আকর্ষণ করিতেছে। কর্ত্তব্য বলিয়া যাহা বুঝিব, তাহাই করিয়া চলিব, সংসারের শত প্রলোভনেও সেই কর্ত্তব্যের পথ হইতে পরিভ্রষ্ট হইব না, সংসারের নিন্দা প্রভৃতি নিদারুণ কঠোর কশাঘাতেও শ্রেয়ের পথ, ধর্ম্মের পথ, মঙ্গলের পথ ক্ষণকালের জন্যও পরিত্যাগ করিব না — ধর্ম্মাধর্ম্মসংগ্রামের এই মহামন্ত্র অবলম্বন করিয়া, সমস্ত হৃদয়ের সহিত আলিঙ্গন করিয়া সংসারে বিচরণ করা মুখে বলিতে বা কানে শুনিতে যত সহজ, কার্য্যে পরিণত করা তত সহজ নয়ই, খুবই কঠিন — অনেক সময়ে মর্ম্মস্থলের শিরাগুলি একে একে ছিঁড়িয়া গিয়া রক্তধারা বহিয়া যায়।

ধর্ম্মের আদেশ বলিয়া যাহা উপলব্ধি করিব, ভগবানের বাণী বলিয়া যাহা অন্তরে শুনিতে পাইব, একনিষ্ঠ হৃদয়ে তাহাই ধরিয়া চলিব; ইহার জন্য ভগবানের চরণে আমিত্বকে বলিদান করিতে হয় করিব, অহঙ্কারকে বিচূর্ণ করিতে হয় করিব — তাহার জন্য মর্ম্মগ্রন্থিসকল একে-একে ছিন্ন হইয়া গেলেও পশ্চাৎপদ হইব না — আমাদের সংগ্রামের ইহাই হইল মূলমন্ত্র। কিন্তু এই অহঙ্কারকে বিসর্জ্জন দেওয়া এই আমিত্বকে বলিদান করা; সকল কার্য্যে, সকল চিন্তায়, সকল ভাবে নিজের হাতের ছাপ দেখিবার ও জগতকে দেখাইবার লোভ সমস্ত হৃদয়ের সহিত পরিত্যাগ করা যে কি কঠিন, কি মর্ম্মচ্ছেদী, তাহা এই পথের পথিক ভিন্ন অপর কাহারও অনুভব করিবার ক্ষমতা আছে বলিয়া মনে হয় না। কঠিন হইলেও, যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত হইবার, রক্তধারায় সমাচ্ছন্ন হইবার সম্ভাবনা থাকিলেও, এই পথে, এই জীবনান্ত মহাসংগ্রামে আমাদিগকে অবতীর্ণ হইতেই

হইবে—কারণ ইহার জন্য ভগবানের আহ্বান আসিয়াছে, তাঁহার পাঞ্চজন্য শঙ্খ বাজিয়া উঠিয়াছে।

এই অনন্তকালব্যাপী সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হও, প্রত্যেকে নিজ নিজ দেহ মন ও আত্মাকে জয়লাভের উপযুক্ত করিয়া তোল। বাহিরের সংগ্রামে যাহা জয়লাভের চিরন্তন পন্থা বলিয়া প্রসিদ্ধ, আমাদের এই অধ্যাত্মসংগ্রামে জয়লাভের পন্থা ঠিক তাহার বিপরীত। আমাদের এই সংগ্রামে জয়লাভের অনন্য সহায়, একমাত্র অস্ত্র হইল অহিংসা, কর্ত্তব্যসাধন, ন্যায়পরতা প্রভৃতি ধর্ম্মবৃত্তি—এক কথায়, ভগবানের আদেশপালন। প্রতি-আঘাত দিবার ক্ষমতা সত্ত্বেও অন্যায় আঘাতকারীকে শিক্ষা দিবার উপযুক্ত শাস্তি মাত্র দেওয়া ব্যতীত তাহার পশ্চাতে প্রতি-আঘাত দিবার আকাঙ্ক্ষা ও উদ্দেশ্য লইয়া ছুটিলাম না; প্রতিহিংসা লইবার জন্য আমার প্রাণ অধীর হইয়া উঠিতেছে, কিন্তু ভগবানের আদেশ, অহিংসা আমাকে তাহা হইতে নিবৃত্ত হইবার জন্য সুগম্ভীর ধ্বনিতে অনুরোধ করিল, আমিও প্রতিহিংসা লইতে নিবৃত্ত হইলাম। এইখানেই তো আমি জয়লাভের পথে বহুদূর অগ্রসর হইলাম। আমাদের অন্তরে ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক ভগবানের যে সুমঙ্গল বাণী নিত্য ধ্বনিত হইতেছে, সেই বাণী প্রতি মুহূর্ত্তে আমাদিগকে সংযমের অভিমুখে চলিবার আদেশ করিতেছে। সেই বাণী প্রতি মুহূর্ত্তেই আমাদিগকে বলিতেছে যে, প্রতি-আঘাত করা জড়ের ধর্ম্ম, প্রতি-হিংসা পশুর ধর্ম্ম; সংযমই মানবের ধর্ম্ম, অহিংসাই মানবকে দেবত্বের পথে উন্নীত করে। অহিংসা ও সত্যপ্রমুখ যে ধর্ম্মভাব আমাদিগকে দেবত্বের পথে লইয়া চলিবে, ভগবানের সংস্পর্শলাভের অধিকারী করিবে, সেই ধর্ম্মভাবই যে অধ্যাত্মসংগ্রামে জয়লাভের সহায়, তাহা বলা বাহুল্য।

ইহার বিপরীতে, দ্বেষহিংসা, অন্যায়, অবিচার-প্রমুখ অধর্ম্মভাব যে পরিণামে সাংসারিক দিকেও পরাজয়ের সহায়তা করে, তাহার পরিচয় আমরা প্রতিপদে প্রাপ্ত হই। ভারতবাসীকে ইহা বলিয়া দিতে হইবে না যে, দুর্য্যোধনপ্রমুখ কৌরবদিগের ধর্ম্মমূলক শ্রেয়ের পরিবর্ত্তে অধর্ম্মমূলক প্রেয়কে আলিঙ্গন করিবার ফলে মৃত্যুর বিকট পদচ্ছায়া, অবনতির করাল অন্ধকার সমগ্র ধরাতলকে, বিশেষত ভারতবর্ষকে কিরূপ সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল। অধুনাতন ইতিহাসপাঠককে বলিয়া দিতে হইবে না যে, অধর্ম্মকে সর্ব্বান্তঃকরণে আলিঙ্গন করিবার ফলেই, রোমকদিগের সম্রাট নীরো যখন আপনাকে মৃত্যুর অতীত ভাবিয়াছিল, তখন মৃত্যুই তাহাকে কিরূপ সর্ব্বতোভাবে ঘিরিয়া ফেলিয়াছিল। বর্ত্তমান যুগের আবালবৃদ্ধবনিতা কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না যে, এই সেদিন ইউরোপের বিভিন্ন জাতি যখন স্বার্থপরতার মোহে অন্ধ হইয়া তাহারই ভিত্তির উপরে নিজেদের সভ্যতা ও সমাজের সমুন্নত সৌধ তুলিবার ব্যবস্থা করিল; স্বার্থসাধনের জন্য দুর্ব্বলের উপর ক্রমাগত অবিচার অত্যাচার করিতে লাগিল; ধনদর্পে জয়গর্ব্বে উন্মত্ত হইয়া নানাবিধ অনাচার কদাচারকে সভ্যতার অঙ্গ বলিয়া গ্রহণ করিল, তখন মৃত্যু তাহাদিগকে শতবিধ নাগপাশে আবদ্ধ করিয়া আপনার অভিমুখে কিরূপ টানিয়া লইল; তখন রুদ্রদেব স্বীয় প্রলয়ঙ্কর মূর্ত্তিতে পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে সংহারযজ্ঞের কিরূপ প্রচণ্ড হুতাশন প্রজ্বলিত করিলেন; তথাকথিত সভ্যতার সমুন্নত সৌধকেও বিধ্বস্ত ও সমভূম করিবার কিরূপ ব্যবস্থা করিলেন। ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, ভগবান স্পষ্টরূপে দেখাইয়া দেন যে, ধর্ম্মকে আমাদের ভিত্তি না করিলে, অধর্ম্মের উপর সংসারকে দাঁড় করাইলে, সমস্ত বিশ্বের ধনরত্ন হস্তগত হইলেও তাহা কাহাকেও ধ্বংসের পথ হইতে, বিনাশের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে পারে না।

আমরা যদি বাঁচিতে চাই, আমরা যদি সত্যই স্বরাজ লাভ করিতে চাই, ভারতে যদি সত্যই স্বাধীনতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে চাই, তবে অধর্ম্ম এবং তাহার সমস্ত অনুচর-সহচরের বিরুদ্ধে সংগ্রাম-ক্ষেত্রে নামিতে হইবে, এবং ধর্ম্মের পথে, কল্যাণের পথে অগ্রসর হইতে হইবে। আমাদের সমাজ বর্ত্তমানে শ্রেয়কে পরিত্যাগ করিয়া প্রেয়ের পশ্চাতে যেরূপ দ্রুতপদে ছুটিয়া চলিয়াছে, তাহাতে আশঙ্কা হয় যে, আমাদের কতদিনের এই পুরাতন হিন্দুসমাজ আর বেশী দিন জীবিত থাকিবে কি না।

আমরা এখন বলকেই ন্যায়ের আসনে বসাইতে পারিলেই সন্তুষ্ট হই; অর্থকেই এখন আমরা উন্নতির একমাত্র মাপকাঠি বলিয়া গ্রহণ করিতেছি; স্বাধীনতা, সত্য, করুণা, নিঃস্বার্থপরতা, সৎসাহস, পবিত্রতা, প্রেম প্রভৃতি অনুচরসকল সমাজ হইতে অগত্যা সরিয়া দাঁড়াইতেছে; আমরাও কাজেই অসত্য, দ্বেষহিংসা, কাপুরুষতা, অশ্লীলতা, অসাধুতা প্রভৃতির সাহায্যে অধর্ম্মের বিষবৃক্ষের তলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া জর্জ্জরিত হইতেছি; অধর্ম্মের অগ্নিতে নিজেদের গৃহদাহের ব্যবস্থা করিয়া মূর্খের মত নিতান্ত বাতুলের মত আহ্লাদের হাসি হাসিয়া আকুল হইতেছি। আমরা দেখিয়াও দেখিতে চাহিতেছি না যে, ধর্ম্মের গ্লানি আমাদের সমাজকে অল্পে অল্পে কিরূপ অধিকার করিতে বসিয়াছে। চক্ষুষ্মান ব্যক্তিমাত্রেই উপলব্ধি করিবেন যে, স্বার্থপরতা, আলস্য, দ্বেষহিংসা প্রভৃতি অধর্ম্মের সহচর অনুচর সকল অগ্রসর হইয়া আমাদের সমাজের বক্ষে কিরূপ স্থায়ী বাসা বাঁধিবার উপক্রম করিতেছে এবং সমাজকে বিপ্লবের এক অতলস্পর্শ ঘুর্ণীর মধ্যে ডুবাইয়া দিবার কিরূপ ব্যবস্থা করিতেছে। আশঙ্কা হয় যে, কোন্ দিন নিদ্রোত্থিত হইয়া দেখিব যে, রুদ্রদেবের মঙ্গল বিধানে পুরাতন সমাজ, পুরাতন যাহা কিছু, বিপ্লবের প্রবল বন্যায় সমস্তই ভাসিয়া গিয়াছে।

আমরা যদি বাঁচিতে চাই, তবে আমাদিগকে ঐ মৃত্যুর সহচর অনুচরগণের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হইবে; বিশ্ববিধাতা পরমেশ্বরের অজেয় পতাকার নিম্নে সমবেত হইয়া বল ও শক্তি সঞ্চয় করিতে হইবে; ধর্ম্মের সাহায্যে অধর্ম্মের পরাজয় সাধন করিতে হইবে; অমৃত পুরুষের সংস্পর্শে অমরণধর্ম্মা হইতে হইবে। চক্ষু খুলিয়া দেখ, অধর্ম্মের সংস্পর্শে সমাজের কত স্থানে পচ ধরিয়াছে। নিজে বাঁচিতে চাহিলে সমাজকেও বাঁচাইতে হইবে। তাই অন্তত নিজের বাঁচিবার জন্যও সাহসপূর্ব্বক সমাজের চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে। এই চিকিৎসায় মৃত্যু পর্য্যন্ত পণ করিতে হইবে; প্রতিপদে সংসারের সঙ্গে মরণান্তিক সংগ্রামে যোঝাযুঝি করিতে হইবে; প্রতিপদে সমাজকে শ্রেয়ের পথে চালাইবার চেষ্টা করিতে হইবে। ভগবানের মঙ্গল বিধানে নূতন নূতন পরমাণুর সাহায্যে আমাদের দেহ যেমন মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে নববেশের সঙ্গে নব বল ও শক্তি লাভ করিতেছে, ধর্ম্মের মাপকাঠিতে সেইরূপ সমাজেরও ক্রমাগত সংস্কার সাধন করিয়া তাহার প্রাণে নবনব মঙ্গলভাবের সঞ্জীবনী সুধা ঢালিতে হইবে এবং সমাজকে ধর্ম্মের নবশক্তিতে শক্তিমান করিয়া তুলিতে হইবে।

এই শুভ কার্য্যে উৎসাহের সহিত লাগিয়া যাও। নিশ্চয় জানিও যে, সেই চিরন্তন ভগবান আমাদের চিরপুরাতন বন্ধু সখা ও সুহৃৎ এবং তিনি আমাদের নিত্যসঙ্গী। তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনেই যখন আমরা প্রবৃত্ত হইতেছি, তখন তিনি নিশ্চয়ই আমাদের সহায় হইবেন। ভুলভ্রান্তি পাপতাপ যাহা কিছু ঘটিয়াছে, তাহার জন্য হাহুতাশ করিও না। পাপতাপে যদি কেহ আপনাকে বড়ই মলিন বোধ কর, তবে অনুতাপের বিমল সলিলে সেই মলিনতা শীঘ্র ধৌত করিয়া ফেল, এবং আপনাকে সেই শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ পরমপুরুষের সিংহাসনতলে দাঁড়াইবার উপযুক্ত কর। তাই বলিয়া অধর্ম্মের সহিত সংগ্রামে পশ্চাৎপদ হইও না। অভয়দাতার মাভৈ-বাণীর ভেরী গর্জ্জিয়া উঠিয়াছে। সত্যই যদি তোমরা অমৃতপুরুষের সন্তান হও, তবে নিদ্রালস্য পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার আহ্বানে সাড়া দাও। তাঁহার নামের বিজয়পতাকা স্কন্ধে লইয়া বিশ্ববাণীকে জাগাইয়া তোল এবং অধর্ম্মের সহিত সংগ্রামে তাঁহার পবিত্র নামের গুণে সর্ব্বত্র বিজয় লাভ করিয়া মনপ্রাণকে আনন্দে পূর্ণ কর।

নববর্ষ।

(শ্রীঅতুলপ্রসাদ সেন বার-এট-ল)

জননীর দ্বারে আজি ঐ
শুন গো শঙ্খ বাজে।
থেক না থেক না ওরে ভাই
মগন মিথ্যা কাজে।
অর্ঘ্য ভরিয়া আনি'
ধর গো পূজার থালি।
রতন-প্রদীপখানি
যতনে আন গো জ্বালি'।

ভরি' লয়ে দুই পাণি
বহি' আনো ফুলডালি।
তব প্রসন্ন পবনে
নবীন জীবন ফুটি;
তব প্রফুল্ল কুসুমে
নব সুগন্ধ লুটি।
তব উজ্জ্বল ভাসে
তোল উজ্জ্বল মাথা,
নব সঙ্গীত তালে
গাও গম্ভীর গাথা।
পর মালা কপালে
নব পল্লব-গাঁথা
শুভ সুন্দর কালে
সাজ নব নব সাজে ॥

রাগ-বিবোধ।

(সোমেশ্বর-কৃত)

(পণ্ডিত ৺হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক অনুবাদিত)

গ্রন্থকার, রাগবিবোধ নামক নিবন্ধ রচনা করিবার অভিপ্রায়ে গ্রন্থের প্রতিপাদ্য রাগের মূলীভূত শ্রুতি স্বরাদির নিদান নাদ সঙ্ক্ষেপে সূচনা করিয়া নিম্নোক্ত শ্লোকে অনিষ্টনিবারক ইষ্টদায়ক স্বকীয় গুরুদেবতা-নমস্কার-রূপ মঙ্গলাচরণ করিতেছেন।

আর্য্যানন্দনিদানং গুরুং স্বরাধাররাগবিষয়মহং।
স্থানবিশেষখ্যাতং গণপতিমতিসিদ্ধয়ে বন্দে ॥ ১

আমি সিদ্ধিলাভের জন্য আর্য্যা পার্ব্বতীর আনন্দকারণ গুরুদেবগণের অনুরাগপাত্র পুরাণপ্রসিদ্ধ গণপতিকে বন্দনা করি। ১

আমি গ্রন্থসমাপ্তির জন্য পার্ব্বতীর আনন্দনিদান, উৎকৃষ্ট, দেবগণের অনুরাগপাত্র, শ্রুতিপুরাণপ্রসিদ্ধ গণপতির বন্দনা করি। পক্ষান্তরে আমি নাদকে বন্দনা করি। নাদোপাসনা দ্বারা ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর উপাসিত হইয়া থাকেন, কারণ ইঁহারা তদাত্মক। শার্ঙ্গদেব নাদসম্বন্ধে এইরূপই কহিয়াছেন। সুতরাং নাদবন্দনা, অভ্যুদয়—অর্থাৎ সিদ্ধির হেতু। এই নাদ আর্য্য পণ্ডিতগণের আনন্দ—ঐহিক ও পারত্রিক সুখের নিদান। আনন্দ স্বর-রাগাদি-সাধ্য, কিন্তু নাদমাত্রের আনন্দজনকতা কিরূপে ঘটিতে পারে? এই জন্য বলা হইয়াছে, স্বররাগাদি সমস্তই নাদমূলক। নাদই স্বরাদিরূপে নানারূপ হইয়া সুখের হেতু হইয়া থাকে। এই নাদ হৃদয় কণ্ঠ মস্তকরূপ স্থান বিশেষে খ্যাত অর্থাৎ মন্দ্র মধ্য ও তার নামে প্রসিদ্ধ। ১

হেতুর্জগদ্ব্যবহৃতের্বিরাজয়ন্তী স্বযোগতো বীণাম্।
জয়তি ব্যাপনশীলা শব্দাত্মব্রহ্মশক্তিঃ সা ॥ ২

সেই শব্দাত্মক ব্রহ্মশক্তি সরস্বতী জয়িনী হউন। তিনি জগদ্ব্যবহারের হেতু, আত্মসংস্পর্শে বীণাকে শোভিত করিতেছেন এবং ব্যাপিনী। ২

এক্ষণে অর্থশ্লেষ দ্বারা প্রকারান্তরে নাদকে সূচিত করিয়া শব্দার্থস্ফুরণকারণ সরস্বতীকে স্মরণ করা হইতেছে। সরস্বতী শব্দাত্ম, অর্থাৎ বর্ণ পদ ও বাক্য-স্বরূপ, অথবা শব্দেই যাঁহার আত্মবুদ্ধি—কিনা যিনি শব্দাভিমানিনী এবং ব্রহ্মার শক্তি, তিনি জয়িনী হউন। লোকব্যবহার অবশ্য শব্দমূলক, সুতরাং জগদ্ব্যবহারের ইনিই হেতু। ইনি ব্যাপকস্বভাব। ইনি স্বীয় অঙ্গসংসর্গে কচ্ছপী বীণাকে শোভিত করিতেছেন। অর্থাৎ বীণায় তাঁহার শোভা নয়, কিন্তু তাঁহার স্পর্শেই বীণার শোভা। নাদপক্ষে ব্যাখ্যা;—সেই প্রসিদ্ধ শব্দাত্মক নাদ-স্বরূপ ব্রহ্মশক্তি জয়যুক্ত হউন। নাদ যে উপাস্য, ইহা দ্বারাও তাহার সূচনা করা হইল। শার্ঙ্গদেবও কহিয়াছেন, চিদানন্দ অদ্বিতীয় নাদব্রহ্মকে উপাসনা করি। সুতরাং নাদ উপাস্য। এই নাদ জগদ্ব্যবহারের হেতু, কারণ বর্ণ-পদ-বাক্যের নাদই ব্যঞ্জক, সুতরাং সমস্ত লোকব্যবহার নাদমূলক। এই বিষয়ে শার্ঙ্গদেব কহিয়াছেন, নাদ দ্বারা বর্ণ ব্যঞ্জিত হয়; বর্ণ হইতে পদ, পদ হইতে বাক্য ব্যঞ্জিত হয়; বাক্য হইতে সমস্ত ব্যবহার নিষ্পন্ন হইতেছে। সুতরাং এই জগৎ একমাত্র নাদের অধীন। ইহা ব্যাপক-স্বভাব। আর ইহা স্বযোগ-বশত অর্থাৎ স্বীয় আবির্ভাব-সূত্রে বীণাকে শোভিত করিতেছেন। এই বীণা শব্দনাদ-প্রকাশ-বিষয় দেহমাত্র ও বাদ্যমাত্রের উপলক্ষণ। কারণ, নাদ ব্যতীত তত্তৎ পদার্থ কাষ্ঠ লোষ্টাদির ন্যায় নিতান্ত ব্যর্থ। এই নাদ যে পরমাত্মশক্তি তদ্বিষয়ে কল্লিনাথ কহিয়াছেন;—পরবাক্ নামক ব্রহ্মশক্তি নাদ-ব্রহ্মের অত্যন্ত নিকটবর্ত্তী, এই হেতু নাদোপাসনা করিলে ব্রহ্ম-প্রাপ্তি হইয়া থাকে। ২

সকলকলোপাখ্যকুলঃ সংখ্যাবন্নাথমেঙ্গনাথজনেঃ।
মুদ্গলসূরেস্তনুজস্তনুধীরপি সোমনামাহং ॥
রাগবিবোধং বিদধে বিরোধরোধায় লক্ষ্যলক্ষণয়োঃ।
প্রাচাং বাচাং কিঞ্চিৎ সারং সারং সমুদ্ধৃত্য ॥ ৩। ৪

সকল-কলা যাহার উপনাম, সেই কুলে আমার জন্ম, আমি পণ্ডিতগণের পতি মেঙ্গনাথের পুত্র মুদ্গলসূরির আত্মজ, আমার নাম সোম। আমি স্বল্পবুদ্ধি হইলেও লক্ষণের সহিত গীতের বিরোধভঞ্জনের নিমিত্ত প্রাচীন

গ্রন্থকারদিগের বাক্যের সারোদ্ধার পূর্ব্বক রাগ-বিবোধ রচনা করিতেছি। ৩। ৪

এই শ্লোকে গ্রন্থকর্ত্তা কুলপিতামহ, পিতা ও স্বনাম খ্যাপন পূর্ব্বক স্বকর্ত্তব্য ব্যক্ত করিতেছেন। আমি রাগ-বিবোধ নামক গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। সকল-কলা এই যাহার উপনাম, আমি সেই কুলে জন্মিয়াছি। সংস্থাবৎ অর্থাৎ পণ্ডিতগণের নাথ "মেঙ্গনাথ" আমার পিতামহ এবং আমি মুদ্গল নামক পণ্ডিতের পুত্র। আমার নাম সোম। আমি অল্পবুদ্ধি। যদি বল, অল্পবুদ্ধি হইয়া নূতন গ্রন্থ কিরূপে রচনা করিতে ইচ্ছা করিতেছ, তদ্বিষয়ে বক্তব্য এই, হনুমান মতঙ্গ নিঃশঙ্ক প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থকারগণের রচিত গ্রন্থের সারাংশ সংগ্রহ করিয়া যখন ইহা রচনা করিতেছি, তখন কোন নূতন গ্রন্থ নির্ম্মাণে যে আমার প্রয়াস, ইহা বলিতে পারি না। এখন বলিতে পার হনুমানাদির গ্রন্থ থাকিতে তোমার এ গ্রন্থে প্রয়োজন কি? ইহারও প্রত্যুত্তর আছে। লক্ষ্য ও লক্ষণ অর্থাৎ লোকপ্রচলিত গীতি ও রাগাদিপ্রকাশক শাস্ত্র—এই উভয়ের মধ্যে একটা বিরোধ দৃষ্ট হইয়া থাকে। তন্নিবারণেই আমার বিশেষ প্রয়াস। অর্থাৎ, লোকপ্রচলিত গীতির সহিত শাস্ত্রের যে একতা আছে, তাহাই দেখান আমার অভিপ্রায়। ৩। ৪

পথ্যাখ্যার্য্যৈবাস্যাং মম বাণ্যাং জয়তি বিপুলাখ্যাস্পৃক্।
যদনুগ্রহাদভীষ্টাঃ সর্ব্বেঽর্থা অত্র সিদ্ধেয়ুঃ ॥ ৫

বিপুলাখ্যাস্পর্শী পথ্যাখ্যা আর্য্যা ছন্দই আমার এই গ্রন্থে জয়যুক্ত হউক—যাহার অনুগ্রহে সমস্ত অভীষ্ট অর্থ সিদ্ধ হইবে। ৫

এক্ষণে গ্রন্থকার শ্লেষে পার্ব্বতীকীর্ত্তন করিয়া গ্রন্থ-নিবন্ধন ছন্দের কথা কহিতেছেন। পথ্যা নামে প্রসিদ্ধ আর্য্যা নামক মাত্রাছন্দই আমার এই গ্রন্থে জয়যুক্ত হউক। ইহা বিপুলাখ্যাস্পর্শী। এই গ্রন্থে কেবল পথ্যারই বাহুল্য, অন্য আর্য্যারও ইহাতে সমাবেশ আছে—যে ছন্দের অনুগ্রহে এই গ্রন্থে আমার অভীষ্ট সমস্ত অর্থ, অর্থাৎ বক্তব্য প্রসিদ্ধ হইবে। ফলিতার্থ এই;—সরিগম প্রভৃতি সংক্ষিপ্ত অক্ষর যাহা ছন্দোনিবদ্ধ বক্ষ্যমাণ রাগ-রূপে প্রসিদ্ধ, তাহা পথ্যা ব্যতীত অন্য ছন্দে সমাবেশিত হইতে পারে না। পক্ষান্তরে ব্যাখ্যা:—আর্য্যা পার্ব্বতীর নাম কীর্ত্তন করি। তাঁহার নাম পথ্যা অর্থাৎ হিতাবহা। তিনি বহুনাম-ধারিণী। তাঁহার অনুগ্রহে ভক্তের অভীষ্ট অর্থাৎ চতুর্ব্বিধ পুরুষার্থ সিদ্ধ হইয়া থাকে। ৫

গীতং দ্বেধা মার্গো দেশীমার্গঃ স যো বিরিঞ্চ্যাদ্যৈঃ।
অন্বিষ্টো ভরতাদ্যৈঃ শম্ভোরগ্রে প্রযুক্তোঽর্চ্যঃ। ৬

গীত দ্বিবিধ মার্গ ও দেশী। যাহা বিরিঞ্চি প্রভৃতি দেবগণ কর্ত্তৃক অন্বিষ্ট এবং ভরতাদি কর্ত্তৃক শম্ভুর সম্মুখে প্রযুক্ত আর অর্চ্চনীয় তাহা মার্গ। ৬

রাগবিবোধ-গ্রন্থ রচনা আমার প্রতিজ্ঞাত। এক্ষণে সেই রাগ প্রতিপাদন আবশ্যক হইতেছে। রাগ গীত-স্বরূপ, ইহা মার্গ ও দেশীভেদে দ্বিবিধ। এই শ্লোকে মার্গের কথা বলা হইতেছে। ইহা বিরিঞ্চি প্রভৃতি দেবগণ-কর্ত্তৃক অন্বিষ্ট বা গবেষিত, সামবেদ হইতে উদ্ধার করিয়া প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ মন্দ্রাদি স্বার্থাখ্য সপ্ত স্বর সংগ্রহপূর্ব্বক প্রবর্ত্তিত, এই জন্য ইহার নাম মার্গ। এই বিষয়ে নিঃশঙ্কের প্রমাণ;—পিতামহ ব্রহ্মা সামবেদ হইতে গীত সংগ্রহ করিয়াছেন। আর ভরত প্রভৃতি ঋষিগণ শম্ভুর সম্মুখে তাহার প্রয়োগ করিয়াছেন, সুতরাং ইহা অভ্যুদয়ের নিদান বলিয়া অর্চ্চনীয়। যদিও প্রাচীন পণ্ডিতেরা গীত বাদ্য নৃত্য এই তিনেরই—মার্গ ও দেশী এই দ্বিবিধ ভেদ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু এস্থলে উপযোগী বলিয়া কেবল গীতেরই তাহা নির্দ্দেশ করা হইল। ৬

দেশে দেশে রুচ্যা যজ্জনহৃদ্রঞ্জনং তু সা দেশী।
সতু লোকরুচিবিকলিতঃ প্রায়োলক্ষ্যাত্র দেশী তৎ।৭

দেশে দেশে রুচি অনুসারে যাহা হৃদয়রঞ্জক তাহা দেশী। কিন্তু মার্গ যেহেতু লোকরুচিবিকলিত, এই জন্য এই গ্রন্থে প্রায় দেশী লক্ষিত হইতেছে। ৭

দেশে দেশে গীত যে গান, রুচি অর্থাৎ অভ্যাস ও অনুরাগবশাৎ লোকের হৃদয়াহ্লাদক, তাহাই দেশী। এই বিষয়ে কল্লিনাথের প্রমাণ:—দেশ শব্দে তত্রত্য অধিবাসী, তাহাদিগের যথেচ্ছ-প্রবর্ত্তিত গীতাদি ক্রিয়ার আচার্য্যকৃত নাম দেশী। এইরূপে গীতের ভেদদ্বয় দেখাইয়া হেতু প্রদর্শন পূর্ব্বক দেশী গীতই এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য তাহা গ্রন্থকার কহিতেছেন। মার্গ লোকরুচি-বিকলিত অর্থাৎ লোকেরা অনুরাগ-সহকারে তাহার আলাপাদি করে না, এই জন্য এই গ্রন্থে দেশীই প্রায় লক্ষিত হইতেছে। 'প্রায়'-শব্দ নির্দ্দেশে মার্গ যে এককালে পরিত্যক্ত তাহাও নহে—এইরূপ বুঝাইতেছে। কোন কোন স্থলে মার্গও গৃহীত হইয়াছে। বৃহদ্দেশী গ্রন্থে মতঙ্গ কহিয়াছেন, অবলা বালক গোপালক ও ক্ষিতিপাল প্রভৃতি সকলেই স্বদেশে স্বেচ্ছাক্রমে অনুরাগের সহিত যাহা গান করে, তাহাকে দেশী বলা যায়। এই মার্গ দুই প্রকার, নিবদ্ধ ও অনিবদ্ধ। যাহা আলাপাদি-নিবদ্ধ তাহা মার্গ, আর যাহা আলাপাদি-বিহীন, তাহাই দেশী বলিয়া খ্যাত। কল্লিনাথও রাগবিবোধের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে কহিয়াছেন, তত্তদ্দেশ-বাসীগণের মনোরঞ্জনই একমাত্র ফল বলিয়া যাহা স্বেচ্ছানুরূপ প্রবর্ত্তিত, তাহাই দেশী।

আর যে সমস্ত গীত স্বেচ্ছানুরূপ প্রবর্ত্তিত নয়, কিন্তু নিয়মবদ্ধ তাহা মার্গ। * ৭

উড়িষ্যার কথা।

(রায়মহাশয় শ্রীসতীন্দ্রনারায়ণ রায়, বি-এল্)

উড়িষ্যায় সভ্যতার কেন্দ্র।

বালেশ্বর, কটক ও পুরী এই তিনটী জেলাতেই বহুকাল হইতে সভ্যতার স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে। সভ্যতার কেন্দ্র সময়বিশেষে পরিবর্ত্তিত হইলেও কোনও দিন এই তিনটী জেলার বাহিরে যায় নাই। আর্য্যগণের উৎকলে প্রথম আগমন বোধ হয় এই তিনটী জেলাতেই হইয়াছিল। পরবর্ত্তী ধর্ম্মবিপ্লবও এই গণ্ডীর ভিতর আবদ্ধ ছিল। বৌদ্ধ, শাক্ত, শৈব ও বৈষ্ণব ধর্ম্ম ক্রমান্বয়ে উড়িষ্যার এই অংশেই সর্ব্বপ্রথমে প্রচারিত হইয়াছে। উড়িষ্যার রাজধানীও এই তিনটী জেলার একটী-না-একটী স্থানে অবস্থিত ছিল। অতএব দেখা যাইতেছে সভ্যতা, বুদ্ধি, বিদ্যা ও বিজ্ঞানের উন্নতি সর্ব্বপ্রথমে এই অংশেই হইয়াছিল। অতি অল্পসংখ্যক আর্য্য ঔপনিবেশিক উড়িষ্যায় আসিয়াছিলেন। আজিও সমাজের নিম্নতম স্তরে বহু অনার্য্য জাতি তাহাদের জাতিগত আচার ও ব্যবহার অক্ষুণ্ণ রাখিয়া হিন্দু-নামে পরিচিত হইতেছে। ইহাদের সংখ্যা বহু লক্ষ হইবে; তাহারা এক প্রকার অস্পৃশ্য বলিলেও চলে। উচ্চ জাতিগণ তাহাদের হাতে জলগ্রহণ করেন না। বাউরি, কণ্ডরা, শঅর, পান, ডোম, মুচি, হাড়ী, তঁঅলা, ঘুশুরিয়া, ওড়চাষা প্রভৃতি জাতির সংখ্যা উড়িষ্যায় মোট জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশের উর্দ্ধ হইবে। উড়িষ্যা শব্দ ওরিশা শব্দের রূপান্তর মাত্র। ওরিশা ওড়দিগের বাসভূমি। এই ওড়গণ আজও অস্পৃশ্য এবং উহাদের হাতে আজ পর্য্যন্ত জল চলে না। এই সকল নিম্নস্তরের জাতিগণ, আর্য্য ও অনার্য্য উভয়ের মধ্যবর্ত্তী; তাহাদিগকে অনার্য্য বলিলেও ভুল হইবে, এবং আর্য্য নামে অভিহিত করিলে অত্যুক্তি দোষ হইবে।

সুবর্ণরেখার মুখ হইতে চিল্কা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগের উপকূল অংশ পূর্ব্বকালে জঙ্গলময় ছিল। এই স্থানের বৃক্ষলতা আবহাওয়া জীবজন্তু ঠিক সুন্দরবনের ন্যায়। এই অংশের অধিবাসীগণ অধিকাংশই অনার্য্য বা অনার্য্যবংশসম্ভূত। পুরীর সুলিয়াগণ যে একটী বিশিষ্ট অনার্য্য জাতি তাহার কোনও সন্দেহ নাই। সমুদ্রকূলস্থ কেউট ও মাল্লারগণ যে অনার্য্য বংশসম্ভূত, তাহা তাহাদের শরীরের গঠন হইতেই বেশ বুঝা যায়। গড়জাত ও সমুদ্রকূল উভয়দিকে অনার্য্য ভূমির মধ্যে আর্য্যগণ বাস করিতেন। এই আর্য্যদিগের ইতিহাসই উড়িষ্যার ইতিহাস।

এখনকার উৎকলের বাহিরে মান্দ্রাজের গঞ্জাম জেলায়, বাংলার মেদিনীপুর জেলায় এবং সিংহভূম, মানভূম, ছোটনাগপুর ও মধ্যপ্রদেশের কিয়দংশে বহুসংখ্যক উড়িয়াভাষী দেখিতে পাওয়া যায়। উড়িষ্যার বিখ্যাত কবি উপেন্দ্র ভঞ্জ গঞ্জাম জেলার ঘুমশর রাজ্যের রাজবংশীয় ছিলেন। সাহিত্য, সঙ্গীত বিদ্যা, এমন কি, স্থপতি বিদ্যাতেও গঞ্জাম উৎকলীয় সভ্যতার অনুবর্ত্তী। বিহার, ছোটনাগপুর মধ্যপ্রদেশ ও মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত উড়িয়াভাষী লোকেরা মাতৃভাষা ও উৎকলীয় সভ্যতার স্রোত হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অনেকটা নির্জীব ও প্রাণহীন হইয়া পড়িয়াছে। সমগ্র উড়িয়াভাষাকে এক শাসনের অধীন করিলে তাহাদিগের সর্ব্বাঙ্গীন কুশল হইতে পারে। এ বিষয়ে উৎকলীয়গণ আজ কয়েক বৎসর ধরিয়া চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু আজিও সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই।

উড়িষ্যার বন্যা ও তাহার অপকারিতা।

মহানদী, ব্রাহ্মণী, বৈতরণী ও সুবর্ণরেখা উড়িষ্যার প্রধান নদী। বর্ষার সময় পর্ব্বত হইতে এই সকল নদীতে অতিরিক্ত পরিমাণে জল আসে এবং দুই তিন মাস পরে নদীগর্ভ জলহীন ও শুষ্ক বালুকাময় হইয়া পড়ে। সমস্ত বৎসর, ষ্টীমার ও নৌকা যাতায়াত করিতে পারে না। বর্ষাকালে নদীসকল জলে স্ফীত হইয়া উভয় কূল প্লাবিত করে। কোন কোন বৎসর এত ভীষণ বন্যা হয় যে, লোকের গরু বাছুর ঘর ও গোলাবাড়ী ভাসিয়া যায়। বন্যা দ্বারা উড়িষ্যার যেরূপ ক্ষতি হয় অন্য কোন দেশের সেরূপ হয় কিনা সন্দেহ। বর্ষার যে প্রচুর জলরাশি নদী দিয়া প্রবাহিত হয় তাহা দ্বারা দেশের অপকার ভিন্ন উপকার হয় না। বহু পূর্ব্বকাল হইতে একটী প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে যে, এক সময় সমুদ্র পূর্ব্ব উপকূলের সমান্তরাল পর্ব্বত

---

* এখানে মার্গ ও দেশী গীতের যেরূপ ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে শাস্ত্র-সম্মত রাগাদি-যুক্ত গীতই 'মার্গ' এবং জংলি ও রাগালাপ-বিবর্জ্জিত লৌকিক গীতই 'দেশী' নামে খ্যাত। পুরাকালের কালোয়াতি গান—যাহা এখন লুপ্তপ্রায়—তাহাই প্রকৃত "মার্গ"।

শ্রেণীর সন্নিকটবর্ত্তী ছিল ; কালক্রমে সমুদ্র ক্রমাগত সরিয়া যাইতেছে।

বালেশ্বর জেলার অন্তর্গত নীলগিরি পর্ব্বতে "রণামার" একটী বিশাল প্রস্তরমূর্ত্তি আছে। প্রবাদ এই যে, এই শৈলমালার পদপ্রান্ত হইতে বৈত বা জাহাজে চড়িয়া বাণিজ্যের জন্য তাঁহার পুত্র বিদেশে গিয়াছিলেন। মাতা তাঁহার প্রতীক্ষায় পর্ব্বতের উপরিস্থিত বাসগৃহে উৎকণ্ঠায় দিন কাটাইতে লাগিলেন। প্রতিদিন প্রভাতে তাঁহার মনে হইত, আজ নিশ্চয়ই তাঁহার পুত্র দ্রব্যসম্ভার লইয়া বিদেশ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে। এইরূপ আশায় ও উৎকণ্ঠায় তিনি প্রত্যেক অর্ণবপোত লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। প্রভাতে যে আশায় তিনি বুক বাঁধিতেন, সন্ধ্যার অন্ধকারে তাহা অবসাদের কালিমায় ভাঙ্গিয়া পড়িত। এইরূপ আশা ও উৎকণ্ঠায়, উদ্বেগে ও অপেক্ষায় তাঁহার দেহ প্রস্তরী-ভূত হইয়া যায় এবং তিনি সংসারের দ্বন্দ্ব ও ক্লেশের পরপারে চলিয়া যান। হিন্দুমাতার পুত্র-স্নেহের এরূপ চিত্র কিম্বদন্তীতে প্রায় আর কুত্রাপি পাওয়া যায় না।

বন্যার সময় জলরাশির সহিত যে কর্দ্দম দ্রবীভূত অবস্থায় আসে, তাহা পরে নদীর মোহানায় থিতাইয়া যায়। সমুদ্রে এই পলিমাটির স্তরের পর স্তর পড়িয়া যাইতেছে; বেলাভূমি ক্রমশ সমুদ্র-গর্ভের দিকে অগ্রসর হইতেছে এবং সমুদ্র ক্রমশ সরিয়া যাইতেছে। নদীর মোহানায় এইরূপে ব-দ্বীপের সৃষ্টি হইতেছে। সমুদ্রকূলে বালুকার নিম্নে কোন কোন স্থানে বড় বড় জাহাজ প্রোথিত অবস্থায় পাওয়া যায়। পূর্ব্বে যে স্থানে এই সকল জাহাজ জলমগ্ন হইয়াছিল, এখন সেই স্থানে বালুকার স্তূপ মাথা তুলিয়া রহিয়াছে। বন্যা উড়িষ্যার সর্ব্ব-প্রধান প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা। এই বন্যার কবল হইতে গ্রামসমূহ রক্ষা করিবার জন্য হিন্দুরাজগণ এবং পরবর্ত্তীকালে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট নদীর বাঁধ প্রস্তুত করিয়া জলপ্লাবন রোধ করিবার চেষ্টায় বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছেন। কিন্তু পলিমাটি পড়িয়া নদীগর্ভ ক্রমশই উচ্চ হইয়া যাইতেছে। সুতরাং তদনুসারে বাঁধের উচ্চতাও ক্রমশঃ বাড়াইতে হইতেছে। এরূপ করিয়া কতদিন চলিতে পারে? বর্ত্তমান পূর্ত্তবিভা-গের বড় বড় কর্ম্মচারিগণ বলিতেছেন যে, বাঁধ প্রস্তুত করাটা ভাল হয় নাই। বন্যার গতি রোধ না করিলে প্রতি বৎসর যতদূর জল পৌঁছিত ততদূর পলি পড়িয়া যাইত। এইরূপে নদীগর্ভ ও তটভূমি উভয়ই ক্রমশঃ উচ্চ হইত। বাঁধের আশ্রয়ে যে সকল গ্রামবাসী বাস করিতেছে, বন্যার সময় তাহাদিগকে যে কি উৎকণ্ঠায় দিন কাটাইতে হয় তাহা বলা যায় না। আজকাল ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ বলিতেছেন যে, পর্ব্বতের শিখর ও সানুদেশের জঙ্গল ক্রমেই নষ্ট হইয়া যাইতেছে বলিয়া প্রতি বৎসর বন্যার জলের সহিত পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে পলিমাটি আসিতেছে। এরূপ অনুমান যে ভিত্তি-হীন নহে তাহা সহজেই বুঝা যায়। কারণ বনজঙ্গল না থাকিলে মাটি ঢিলা হওয়ায় বর্ষা ও বন্যার জলে অধিক পরিমাণে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। বন্যার বেগ মন্দীভূত করিবার জন্য হিন্দুরাজগণ আর একটী উপায় অবলম্বন করিতেন। আজকাল ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট তাহা করেন না। বোধহয় সে উপায় অবলম্বন করিবার সুবিধা আজকাল নাই। হিন্দু-রাজগণ খাদ খুলাইয়া নদীর সহিত দিগন্তপ্রসারী মনুষ্যবাসহীন নিম্নভূমির যোগ করাইয়া দিতেন। সমতলক্ষেত্রে আসিবার পূর্ব্বে নদীর উভয় পার্শ্বে এরূপ নিম্নভূমি নিতান্ত বিরল নহে। বন্যার জল নিম্নভূমিতে জমিয়া এক প্রকাণ্ড জলাভূমির আকার ধারণ করিত। এইরূপ জল সংরক্ষণের দ্বারা কৃষিকার্য্যের উৎকর্ষ সাধন হইয়া দেশের প্রভূত কল্যাণ হইত। আজকাল প্রায় সমস্ত জমিতেই চাষ-আবাদ হইতেছে, এবং দেশের লোকসংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বর্দ্ধিত হইয়াছে ; অতএব বর্ষার প্লাবনের বেগ কমাইবার জন্য বহু পরিমাণে জন-মানবহীন পতিত জমি পাওয়া দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে নদীর মুখে পলিমাটি সঞ্চিত হইয়া প্রতিবর্ষে নূতন জমি হইতেছে, এবং সাগর ক্রমশঃ সরিয়া যাইতেছে। এই পলিমাটির সঞ্চয়ে দেশে ব্যবসাবাণিজ্যের যে কিরূপ ক্ষতি হইয়াছে, তাহা বিশদভাবে না বলিলে সহজে বুঝা যাইবে না। এইরূপ সামান্য সামান্য কারণ হইতেই ঘোরতর বিপদের সূত্রপাত হয়।

উড়িষ্যার বন্দর ও বাণিজ্য।

চিল্কাহ্রদে প্রাচীনকালে সমৃদ্ধিশালী পোতাশ্রয়

ও বন্দর ছিল। লাক্কাদ্বীপ, মালদ্বীপ, সকোট্রা প্রভৃতি সুদূর স্থান হইতে দেশীয় অর্ণবপোতনিচয় এই হ্রদে আসিয়া নঙ্গর গাড়িত। এখন চিল্কাহ্রদের গভীরতা দিন দিন কমিয়া যাইতেছে। বালেশ্বরের নিকট 'বুড়াবলং' নদীর মুখও এইরূপ কম গভীর হইয়া গিয়াছে। বড় বড় অর্ণবপোত উড়িষ্যার উপকূলে আসিয়া বাণিজ্য করিতে পারে না। উপকূলের কোন স্থানে উপযুক্ত পোতাশ্রয় আজ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। ধামড়া নদীর মুখে বন্দর করিবার কথা বিহার-উড়িষ্যার ব্যবস্থাপক সভায় উঠিয়াছিল, কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারগণ সকলদিক দেখিয়া এই প্রস্তাবকে অসম্ভব বলিয়া অগ্রাহ্য করিয়াছেন। বন্দরের অভাব উড়িষ্যার ভবিষ্যৎ বাণিজ্যের উন্নতির প্রধান অন্তরায়। গত শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্য্যন্ত চাঁদবালী ও বালেশ্বর হইতে দেশীয় অর্ণবপোত কলিকাতা, আন্দামান, মান্দ্রাজ ও ব্রহ্মদেশের উপকূলে অনুকূল বায়ুর সাহায্যে যাতায়াত করিত। বিজয়াদশমীর পর দেশীয় অর্ণবপোত উড়িষ্যার উপকূল হইতে রওনা হইত এবং চৈত্রসংক্রান্তির পূর্ব্বে এদেশে ফিরিয়া আসিত। এই সকল দেশীয় পোত সমুদ্র দিয়া যাতায়াত করিত বটে, কিন্তু আধুনিক জাহাজের মত বোঝাই লইতে পারিত না। রেলওয়ে লাইন খুলিবার ফলে দেশীয় পোত একেবারে উঠিয়া গিয়াছে। ষ্টীমার বা অগ্নিবোটের সহিত প্রতিযোগিতায় দেশীয় পোত আঁটিয়া উঠিতে পারিত না সত্য, কিন্তু ব্যবসাদারগণ নিজ নিজ পোতের সাহায্যে বিদেশে মাল পাঠাইয়া লাভবান হইতেন বলিয়া অগ্নিবোটের প্রতিযোগিতায় দেশীয় পোত একবারে নষ্ট হয় নাই। উপকূলের সর্ব্বস্থানেও অগ্নিবোট যাতায়াত করিত না।

রেলওয়ের প্রতিযোগিতায় দেশীয় পোতের সর্ব্বনাশ হইয়াছে। উড়িষ্যার মধ্যে বালেশ্বর, দেশীয় পোতের প্রধান আড্ডা ছিল। ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে বুড়াবলং নদীতে বহুসংখ্যক সূপ ও দেশীয় জাহাজ দেখা যাইত। এখন মাত্র পাঁচ ছয়খানি বড় বোট অতীতের সাক্ষীস্বরূপ রহিয়াছে। বালেশ্বরের ভিন্ন ভিন্ন "বাঁকশাল" বা ডকে শত শত মিস্ত্রী ও কারিগরগণ জাহাজনির্ম্মাণ কার্য্যে ব্যস্ত থাকিত এবং তাহাদের কাজের শব্দে দিগন্ত মুখরিত হইত; কিন্তু এখন সেই সকল স্থান নীরব ও জনশূন্য।

ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট মহানদী বাঁধিয়া কতকগুলি কেনাল বা খাল করিয়াছেন; তাহা দ্বারা কটক জেলার অনেকাংশে জল সরবরাহ হয়। কেনালের সন্নিকটস্থ জমিতে বিশেষ অজন্মা হয় না, তাহার দরুণ কেনালের পার্শ্ববর্ত্তী জমি উচ্চ মূল্যে বিক্রয় হয়। ধানই উড়িষ্যার প্রধান ফসল। ধানজমিতে অন্যান্য ফসল জন্মাইয়া উড়িষ্যার চাষারা লাভবান হইবার উপায় জানে না। সমগ্র উড়িষ্যায় যে ফসল উৎপন্ন হয় তাহা লোকসংখ্যার অনুপাতে পর্য্যাপ্ত নয়। সেই কারণে প্রতি বৎসর বহুলোক চা-বাগান ও কলিকাতার নিকটবর্ত্তী কলসমূহে মুটেমজুরের কাজ করিতে চলিয়া যায়। চাষ ভিন্ন এদেশে উপজীবিকার অন্য কোন উপায় নাই। ব্যবসা-বাণিজ্য নাই বলিলেই হয়; যাহা কিছু আছে, তাহাও দেশীয় লোকের হাতে নাই। সুদূর রাজপুতানা হইতে মাড়োয়ারীরা আসিয়া পাইকারী কারবার একচেটিয়া করিয়া ফেলিয়াছে।

উড়িষ্যার জমিদারী।

উড়িষ্যায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নাই, প্রত্যেক ৩০ বৎসর অন্তর নূতন বন্দোবস্ত হইয়া রাজস্ব বর্দ্ধিত হয়। বড় বড় জমিদারের প্রজার নিকট হইতে প্রাপ্য খাজানা কোন বৎসরই সম্পূর্ণ আদায় হয় না। প্রতি বৎসর কিছু-না-কিছু বাকী পড়িয়া যায়। সামান্য অজন্মা হইলেই রাজস্ব দাখিল করা তাঁহাদের পক্ষে কঠিন হইয়া উঠে। আমার মনে হয় বন্দোবস্তের পর বন্দোবস্তের দ্বারা রাজস্ব অতিরিক্ত বর্দ্ধিত হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে যে হারে রাজস্ব আদায় করা হয় সে হারে রাজস্ব দাখিল করিবার সামর্থ্য জমিদারদিগের নাই। এদেশে জমিদার হইবার সাধ অতি প্রবল; চাকরী বা ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়া কিঞ্চিৎ অর্থ সঞ্চয় করিলে লোকে তদ্দ্বারা জমিদারী ক্রয় করে। তাহাদের বংশধরগণ ব্যবসাবাণিজ্য ভুলিয়া আয়েসী হইয়া পড়ে, এবং দুইএক পুরুষের মধ্যেই রাজস্ব দাখিল করিতে অক্ষম হইয়া জমিদারী পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়।

উৎকলবাসীর স্বভাব ও অবস্থা।

সাধারণ লোকের স্বভাবের বিষয় বলিতে হইলে বলিতে হইবে যে, তাহারা শ্রমকাতর স্বল্পসন্তুষ্ট ও ভবিষ্যদ্ভাবনাশূন্য; নূতন কিছু ব্যবসা অবলম্বন করিয়া অর্থাগমের উপায় করিতে তাহারা একান্ত নারাজ,

কোন গতিকে গ্রাসাচ্ছাদন চলিয়া গেলেই তাহারা সন্তুষ্ট, তাহারা অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে চায় না। এদেশে মিতাক্ষরা আইনানুসারে পিতার সহিত পুত্রের সমান অধিকার আছে। এইরূপ অবিভক্ত হিন্দু পরিবার সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া রহিলে জীবনসংগ্রামের তীব্রতা কিয়ৎ পরিমাণে হ্রাস হয়। বর্ত্তমান যুগ-ধর্ম্মে অবিভক্ত মিতাক্ষরা-পরিবারের সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া যাইতেছে। কিছুদিন পূর্ব্বেও এদেশে ৪০।৫০ জন সরিক একান্নে একবাসে পিতা পিতামহ লইয়া দিনপাত করিত। এখন এরূপ পরিবার আর দেখা যায় না। পিতা ও পুত্রের মধ্যে পৈতৃক সম্পত্তি লইয়া মনোমালিন্য ও ভাগ-বিভাগ হইয়া যাইতেছে। এরূপ অবস্থায় জীবন-সংগ্রাম তুমুল হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু অবস্থার পরিবর্ত্তনে যেরূপ স্বাবলম্বন ও আত্মনির্ভর বিকসিত হওয়া উচিত তাহা হয় নাই। ফলে লোকের আর্থিক অবস্থা ক্রমশঃ খারাপ হইয়া আসিতেছে। স্বাবলম্বী আত্মনির্ভরশীল ও অক্লান্তকর্ম্মী ইউরোপীয়দিগের অনুকরণ করিতে গিয়া এদেশীয়দিগের সকল বিষয়েই দুর্দ্দশার একশেষ হইতেছে। পূর্ব্বে উড়িষ্যার সর্ব্বত্রই চরকায় কাটা সুতার কাপড় পাওয়া যাইত, এবং লোকে মোটা কাপড় পরিয়া ভদ্র সমাজে গতায়াত করিত। এখন বিলাতী বস্ত্রের প্রচলনে দেশের বস্ত্রশিল্প প্রায় লোপ পাইতে বসিয়াছে, মোটা কাপড় কুলি মজুরেরাও পছন্দ করে না। বিলাতী বস্ত্রের সহিত নানা প্রকার বিলাতী দ্রব্য দেশে অবাধে বিক্রয় হইতেছে। এক কথায়, এদেশের অবস্থার অনুপাতে বিলাস ব্যসন অতিরিক্ত পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে, দেশের আর্থিক অবস্থাও এই কারণে ক্রমশঃ শোচনীয় হইয়া পড়িতেছে। উড়িষ্যার গ্রামগুলি অতি স্বাস্থ্যকর ছিল। প্রায় ২৫ বৎসর পূর্ব্বে এদেশে রেল রাস্তা হয়। ২।৩ বৎসর হইল সমগ্র উড়িষ্যার গ্রামে গ্রামে ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতেছে। এদেশের গ্রামের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে অতি শীঘ্রই ম্যালেরিয়া মহামারীর প্রকোপ কমিয়া যাইবে আশা করা যায়; কারণ প্রাকৃতিক নিয়মে রোগপ্রতিষেধের শক্তি বর্দ্ধিত হওয়ায় রোগের প্রকোপ এরূপ প্রবল থাকিতে পারিবে না, কিন্তু জীর্ণজ্বর দেশব্যাপী হইয়া পড়িবে। এইরূপ হইলে লোকের আর্থিক অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া পড়িবে ও লোকের কার্য্য-করী শক্তি ক্রমশঃ কমিয়া যাইবে।

উড়িষ্যার খনি।

দেশের আর্থিক অবস্থা আলোচনা করিতে করিতে একটী আশার কথা মনে উদিত হয়। জনমানবহীন পর্ব্বতে ও জঙ্গলে প্রকৃতির অপরিসীম দয়ার প্রস্রবণস্বরূপ কত কত গুপ্ত আকর যে রহিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। ময়ূরভঞ্জের গরুমহিষাণি হইতে লৌহ সংগ্রহ করিয়া টাটা কোম্পানি টাটা নগরে তাঁহাদের বিশাল কারখানা চালাইতেছেন। লক্ষ লক্ষ কুলি-মজুর সেই কারখানায় কাজ করিয়া জীবিকার সংস্থান করিতেছে। ভারতবর্ষের মধ্যে টাটা নগরের মত কল-কারখানা ও কুলি-মজুরের সমাবেশ আর কুত্রাপি দেখা যায় না। কিছুদিন পূর্ব্বে এই টাটা-নগর শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্য মাত্র ছিল। তালচের রাজ্যে সম্প্রতি একটী বিশাল কয়লার খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে। কালক্রমে ঐখানে পুরা দমে কার্য্য চলিলে আসানসোল বা ঝরিয়ার মত সহর বসিয়া যাইবে। কেঁউঝর রাজ্যে সোনা ও অভ্রের খনি বাহির হইবার কথা শুনা যাইতেছে। উড়িষ্যার প্রত্যেক মিত্র-রাজ্যেই কোন না কোন ধাতুর খনি আছে। কালক্রমে এই সকল খনিতে কার্য্যারম্ভ হইলে, প্রভূত অর্থাগম হইতে পারে। তবে এদেশের লোকের ভাগ্যে কতটুকু পড়িবে তাহা বলা কঠিন। জ্ঞান ও বিজ্ঞানের বলে বিদেশীয় ধনীগণ, বিদেশীয় মূলধনে খনির কার্য্য চালাইবেন, এদেশীয় কুলি-মজুর কায়িক পরিশ্রমের জন্য কিছু মুনফা পাইবে-মাত্র; তাহারা যে তিমিরে, সে তিমিরে রহিয়া যাইবে।

পার্শ্বনাথ-চরিত।

(শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ বি-এ)

(গত চৈত্র-সংখ্যার অনুবৃত্তি)

ষষ্ঠ ও সপ্তম জন্ম।

এই অচ্যুত-স্বর্গে দ্বাবিংশতি সাগর পরিমিত কাল অতিবাহিত করিয়া পুনরায় মরুভূতির জীবাত্মা জম্বুদ্বীপের পদ্মনামক দেশান্তর্গত অশ্বনগরের রাজা বজ্রবীর্য্যের

পাটরাণী বিজয়ার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিলেন। এবার তাহার নাম হইল বজ্রনাভি। বজ্রবীর্য্য অতিশয় সমারোহের সহিত পুত্রের জন্মোৎসবকার্য্য সম্পন্ন করিলেন। দেখা গেল বজ্রনাভির দেহে চৌষট্টি শুভ লক্ষণ রহিয়াছে।

বয়স হইলে বজ্রনাভি নানাবিধ বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া উঠিল। বিদ্যাশিক্ষার পর রাজা বহু সুন্দরী রাজকন্যার সহিত তাহার অনেকগুলি বিবাহ দিলেন। কিছু দিন পরে সে স্বয়ং রাজ্যভার গ্রহণ করিল। একদিন আয়ুধশালার মধ্যে গিয়া সে 'চক্ররত্ন' প্রাপ্ত হইল। ঐ রত্নপ্রাপ্তির পর সে দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইল এবং বহু দেশ জয় করিয়া 'চক্রবর্ত্তী' এই পদ প্রাপ্ত হইল।

এইরূপ অপূর্ব্ব ঐশ্বর্য্যসুখ ভোগ করিতে থাকিলেও বজ্রনাভির চিত্ত সর্ব্বদা ধর্ম্মানুষ্ঠানেই রত থাকিত। সে যথানিয়মে সযত্নে শ্রাবকের শাস্ত্রবিহিত সমস্ত আচার পালন করিত। চৈত্যালয়ে যাইয়া জিনপূজা, গুরুপূজা প্রভৃতি কার্য্য করিতে তাহার কোন দিনও বাধা হইত না।

একদিন ঘটনাক্রমে ক্ষেমঙ্করনামক মুনিবরের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। মুনির নিকট যাইয়া তাঁহাকে তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়া অতিশয় বিনয়ের সহিত বজ্রনাভি তাঁহার উপদেশ শুনিতে প্রবৃত্ত হইল। উপদেশ শুনিয়া তাহার মনে ঘোর বৈরাগ্য উপস্থিত হইল এবং সমস্ত ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া সে মুনিদীক্ষা গ্রহণ করিল।

এদিকে কমঠের জীবাত্মা অজগর জন্মের অবসানে ষষ্ঠ নরকে যাইয়া দ্বাবিংশতি সাগর পরিমিত কাল নানাবিধ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া এই সময় বিহিতকুরঙ্গ নামক বনবাসী ব্যাধরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। হাতে তীর-ধনু লইয়া সে পশুবধ করিত এবং সেই পশুর মাংসেই তাহার উদর পূরণ হইত। একদিন ঘুরিতে ঘুরিতে সে বজ্রনাভি মুনির নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। মুনিকে দেখিবামাত্র তাহার পূর্ব্বজন্মের শক্রতার সংস্কারবশতঃ ক্রোধ উৎপন্ন হওয়াতে তীর মারিয়া তখনই সে মুনির প্রাণহরণ করিল। মৃত্যুর পর মুনি মধ্যম গ্রৈবেয়কে * অহমিন্দ্ররূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। আর মুনিকে হত্যা করিয়া ব্যাধ কিছুদিন বাদে মৃত্যুমুখে পতিত হইলে সপ্তম নরকে যাইয়া দুঃসহ দুঃখ ভোগ করিতে লাগিল।

অষ্টম জন্ম।

এইবার মরুভূতির জীবাত্মা অযোধ্যার বজ্রবাহুনামক ইক্ষ্বাকুবংশীয় জৈনধর্ম্মাবলম্বী রাজার রাণী প্রভাকরীর গর্ভে যাইয়া জন্মগ্রহণ করিল। এবার তাহার নাম হইল আনন্দকুমার। আনন্দকুমারের আকৃতি অতিশয় সুন্দর ছিল। যৌবনে বহু রাজকন্যার সহিত তাহার বিবাহ হইল। রাজ্যলাভ করিয়া সে প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া উঠিল এবং বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিল।

একদিন আনন্দ সিংহাসনে বসিয়া আছেন, এমন সময় স্বামিহিতনামক মন্ত্রী আসিয়া তাঁহার নিকট বলিল—'মহারাজ, আজ হইতে নন্দীশ্বর পর্ব্বের প্রারম্ভ। * সকলেই আজ নন্দীশ্বর ব্রত ধারণ করিয়া জিনমন্দিরে পূজাদি মহোৎসবের অনুষ্ঠান করিতেছে। জিনদেবের পূজা দ্বারা মহা পুণ্য সঞ্চয় হয়। অতএব, আপনিও এই পর্ব্বের অনুষ্ঠান করুন। কেননা, এই পর্ব্বের অনুষ্ঠান করিলে আপনার যথেষ্ট পুণ্যসঞ্চয় হইবে।'

মন্ত্রীর উপদেশ শুনিয়া রাজা নগরে মহোৎসবের আয়োজন করিবার জন্য আদেশ দিলেন। নিজেও স্নান করিয়া জিনমন্দিরে গেলেন এবং সেখানে ভক্তির সহিত বিবিধ সামগ্রীর দ্বারা জিনদেবের পূজা করিলেন। পূজা করিবার সময়ই রাজার মনে সন্দেহ হইল—'এ প্রতিমা ত অচেতন। ইহার পূজা করিলে কি লাভ হইবে? ইহার ত কোনরূপ ফল দান করিবার শক্তি নাই। অতএব, এ ব্যর্থ পরিশ্রম করিতেছি কেন?'

তখন তিনি দেখিলেন, বিপুলমুনিনামক একজন মুনি সেই মন্দিরে দেবদর্শন উপলক্ষে আসিয়াছেন। রাজা তাঁহার নিকট গিয়া সবিনয়ে নিজের সন্দেহের কথা ব্যক্ত করিলে মুনিবর স্থিরভাবে বলিলেন—'শোন, আমি সমস্তই বুঝাইয়া দিতেছি। প্রতিমা মানুষের মনে ভাল বা মন্দ ভাব জাগাইয়া দিবার এক নিমিত্ত-কারণ। স্বচ্ছ স্ফটিকের পশ্চাতে রক্তপুষ্প রাখিলে যেমন উহা রক্তবর্ণ ধারণ করে আর কৃষ্ণবর্ণের পুষ্প রাখিলে যেমন উহা কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে, সেইরূপ যে প্রকারের প্রতিমা মানুষের চক্ষে পড়ে তাহার চিত্তবৃত্তিও সেই প্রকারই হইয়া থাকে। মন্দির মধ্যে যদি কেহ বীতরাগ জিনমূর্ত্তি দর্শন করে তাহা হইলে তাহার চিত্তে ক্ষণকালের জন্যও অন্ততঃ কিছু-না-কিছু বৈরাগ্যের উদয় হইবে; আর যদি সে সেরূপ মূর্ত্তির পরিবর্ত্তে কোনও বারবণিতার চিত্র দেখে তাহা হইলে তাহার মনে স্বতঃই লালসার ভাব জাগিয়া উঠিবে।

* জৈনমতে ষোল স্বর্গের উপরে অধোগ্রৈবেয়ক, মধ্যগ্রৈবেয়ক ও ঊর্দ্ধগ্রৈবেয়ক নামক তিনটী স্থান আছে। এই সকল স্থানে দেবতারা বাস করেন।

* এই পর্ব্বের অপর নাম অষ্টাহ্নিক পর্ব্ব। বৎসরে তিনবার এই পর্ব্বের অনুষ্ঠান হয়। কার্ত্তিক, ফাল্গুন ও আষাঢ় মাসের শুক্লা অষ্টমী হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত এই পর্ব্ব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এই সময় মন্দিরে মন্দিরে মহা সমারোহের সহিত পূজাকার্য্য হইয়া থাকে। কেহ কেহ এই আট দিন নিরম্বু উপবাস করিয়া থাকেন—কেহ কেহ আট দিনই একবেলা আহার করেন—কেহ কেহ বা এই আট দিন ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকেন। ফলতঃ, প্রত্যেক শ্রাবকই অষ্টাহ্নিক পর্ব্বের সময় যথাশক্তি সংযমের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন।

'মানুষের কর্ম্ম তাহার মনের ভাবের অনুরূপই হইয়া থাকে। মনে সাধুভাবের উদয় হইলে মানব সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্ত হয় এবং সেই সৎ-কর্ম্মের অনুষ্ঠানের ফলে সে পুণ্য এবং সুফল লাভ করিতে সমর্থ হয়। আর মনে অসাধু ভাবের উদয় হইলে মানব স্বতই অসৎ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় এবং তাহার ফলে নানা দুঃখ ও দৈন্যের মধ্যে জীবন যাপন করিতে বাধ্য হয়।

'সুতরাং যাহাতে সৎকার্য্যে প্রবৃত্তি জন্মে সে জন্য মনে সাধুভাব জাগাইয়া তুলিতে হইবে এবং সাধুভাব জাগানর পক্ষে দেবপ্রতিমার দর্শন-পূজনাদি বিশেষ অনুকূল। দেবতার মূর্ত্তিদর্শন, ঐ মূর্ত্তির পূজা, দেবতার গুণের চিন্তন, ধ্যান প্রভৃতি এই প্রকারে পরম্পরাক্রমে মোক্ষের কারণ হইয়া থাকে; কেন না সাধুকর্ম্মানুষ্ঠানেরই চরমফল মোক্ষলাভ।

'এই প্রতিমা এক সামান্য শিল্পকার প্রস্তুত করিয়াছে সত্য—এ প্রতিমা অচেতন তাহাও সত্য, তথাপি ইহার দর্শন-পূজন প্রভৃতির দ্বারা অন্তঃকরণে যে শুভভাবের উদয় হয় তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই।'

এই সকল কথা শুনিয়া রাজার মনে ভারী আনন্দ হইল। তিনি সেই দিন হইতেই সকাল-সন্ধ্যায় প্রাসাদের ছাদে উঠিয়া সূর্য্যবিমানস্থিত জিনমন্দির ও জিন-প্রতিমার উদ্দেশে অর্ঘ্য প্রদান করিতে লাগিলেন এবং জিনদেবের ধ্যানে মগ্ন হইতে লাগিলেন। ইহা ছাড়া, তিনি নিজে এক সূর্য্যবিমান তৈয়ারী করিলেন এবং তাহার মধ্যে এক জিনমন্দির নির্ম্মাণ করিয়া প্রতিদিন সেখানে যথানিয়মে পূজাদি করিতে লাগিলেন। প্রজাগণও রাজার দেখাদেখি প্রতিদিন সূর্য্যকে নমস্কার করিতে এবং তাঁহার উদ্দেশে অর্ঘ্যপ্রদান করিতে লাগিল। *

এক দিন রাজা আনন্দকুমার সভামধ্যে বসিয়াছিলেন। সহসা আয়নার দিকে চাহিয়া তিনি দেখিলেন, তাঁহার মাথার একগাছি চুল সাদা হইয়া গিয়াছে। উহা দেখিয়াই তাঁহার মনে বৈরাগ্য উৎপন্ন হইল এবং নিজপুত্রের উপর রাজ্যভার অর্পণ করিয়া তিনি সাগর-দত্ত নামক মুনির নিকট হইতে দিগম্বরী দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। দীক্ষাগ্রহণ করিয়া যথানিয়মে মুনির সমস্ত আচার পালন করিতে লাগিলেন।

তপস্যার প্রভাবে তাঁহার অলৌকিক শক্তি জন্মিল এবং তিনি নানাপ্রকার ঋদ্ধি লাভ করিলেন। যে বনে তিনি তপস্যা করিতেছিলেন সে বনের সমস্ত দুঃখ দূরীভূত হইল—শুষ্ক সরোবর জলে ভরিয়া উঠিল—সমস্ত ঋতুর ফুল ও ফল একসঙ্গে দেখা দিল—সিংহ প্রভৃতি হিংস্র জীব হিংসা ভুলিয়া হরিণের সহিত মিলিত হইয়া খেলা করিতে লাগিল।

পাপী কমঠের আত্মা নরকে নানাপ্রকার দুঃখকষ্ট ভোগ করিয়া এই সময় সেই বনের মধ্যেই সিংহরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া বাস করিতেছিল। বনের সকল পশু হিংসা ত্যাগ করিলেও সে সম্পূর্ণরূপে উহা ত্যাগ করিতে পারে নাই। আনন্দকুমারকে দেখিতে পাইয়াই তাহার পূর্ব্ব-জন্মের শত্রুতার সংস্কার উদ্বুদ্ধ হইল। তাই একদিন মুনিবর যখন বনমধ্যে ধ্যানমগ্ন ছিলেন তখন আসিয়া সে উহাঁর গলা টিপিয়া ধরিল এবং তীক্ষ্ণ নখের দ্বারা মুনির সমস্ত শরীর বিদীর্ণ করিয়া ফেলিল। মুনিবর স্থিরভাবে সমস্ত সহ্য করিলেন—মনের মধ্যে অণুমাত্র ক্রোধ উৎপন্ন হইতে দিলেন না—পক্ষান্তরে উত্তম ক্ষমার ভাব ধারণ করিলেন।

এইরূপ অবস্থায় কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁহার মৃত্যু হইলে তিনি ত্রয়োদশ স্বর্গে যাইয়া নানাপ্রকার সুখভোগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু মোক্ষলাভের জন্য সর্ব্বদাই তিনি ব্যগ্র ছিলেন। তাই এ সকল সুখই তাঁহার নিকট তুচ্ছ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

যাহা হউক, তিনি সেই স্বর্গে থাকিয়াও প্রতিদিন যথানিয়মে চৈত্যালয় দর্শন ও জিনপূজা প্রভৃতি কার্য্য করিতে লাগিলেন। স্বর্গে যে সকল সম্যগ্দর্শনরহিত দেবতা ছিলেন তিনি তাহাদিগকে উপদেশ দিয়া তাঁহাদিগের চিত্তবৃত্তির পরিবর্ত্তন আনয়ন করিলেন। এইরূপে অতিশয় সুখের সহিত তিনি বিংশতি সাগরপরিমিতকাল সেখানে কাটাইলেন।

দশম জন্ম—পার্শ্বনাথ।

পুরাকালে কাশীদেশে বারাণসী নামে এক নগর ছিল। কাশ্যপগোত্রীয় ইক্ষ্বাকুবংশীয় বিশ্বসেন সেখানকার রাজা ছিলেন। তাঁহার পাটরাণী বামাদেবী অতিশয় সুন্দরী ও পতিব্রতা ছিলেন।

একদিন স্বর্গে সৌধর্ম্মেন্দ্র * কুবেরকে ডাকিয়া বলিলেন—'ত্রয়োদশ স্বর্গস্থ ইন্দ্রের এখনও ছয়মাস আয়ু আছে। আয়ু শেষ হইলে তিনি ভরতক্ষেত্রে বিশ্বসেন রাজার ঔরসে বামাদেবীর গর্ভে ত্রয়োবিংশ তীর্থঙ্কররূপে জন্মগ্রহণ করিবেন। অতএব আপনি বারাণসীনগরে বিশ্বসেন রাজার বাড়ীতে যাইয়া পঞ্চাশ্চর্য্য বৃষ্টি করুন।'

ইন্দ্রের আজ্ঞা পাইয়া কুবের বিশ্বসেনের বাড়ীতে নানারূপ রত্নবৃষ্টি করিলেন। প্রতিদিন সাড়ে তিনকোটি

* জৈনদিগের মতে এই ঘটনা হইতেই ভারতবর্ষে মূর্ত্তিপূজার সূচনা হয়। সূর্য্যবিমান—উর্দ্ধলোকবিশেষ।

* সৌধর্ম্ম-স্বর্গের অধিপতি ইন্দ্র সৌধর্ম্মেন্দ্র নামে পরিচিত।

রত্ন বর্ষিত হইতে লাগিল। কল্পবৃক্ষের পুষ্প, সুগন্ধি সলিল প্রভৃতিরও বৃষ্টি হইতে লাগিল—দুন্দুভি বাজিতে লাগিল—আকাশ হইতে দেবগণ জয় জয় শব্দ করিতে লাগিলেন। ছয়মাস যাবৎ এইরূপ পঞ্চাশ্চর্য্য হইতে লাগিল। ইহা দেখিয়া বহু অজৈন জৈনধর্ম্ম গ্রহণ করিল। *

ঋতুস্নাতা বামাদেবী একরাত্রিতে ষোলটী স্বপ্ন দেখিলেন। প্রাতঃকালে স্নানাদি নিত্যক্রিয়া সমাপনান্তে তিনি সখীদিগের সহিত রাজসভায় গেলেন। রাজা আদরের সহিত তাঁহাকে অর্দ্ধাসন ছাড়িয়া দিলেন। † উপবিষ্ট হইয়া তিনি যে ষোলটী স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন এক এক করিয়া তাহাদের সমস্তগুলিই রাজার নিকট বলিলেন এবং রাজার নিকট তাহাদের ফল জানিতে চাহিলেন।

রাজা বলিলেন—'তোমার গর্ভে তীর্থঙ্কর আসিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। স্বপ্নে যেরূপ দেখিয়াছ—তোমার পুত্রের সেইরূপ সমস্ত গুণই হইবে।' রাজার এই কথা শুনিয়া রাণী মনে মনে বড়ই আনন্দিত হইলেন।

সৌধর্ম্মেন্দ্র যখন জানিতে পারিলেন যে বামাদেবীর গর্ভে তীর্থঙ্কর প্রবেশ করিয়াছেন তখনই তিনি শ্রী, হ্রী প্রভৃতি দেবীকে ডাকিয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন—'বিশ্বসেন রাজার রাণী বামাদেবীর গর্ভে তীর্থঙ্কর প্রবেশ করিয়াছেন। অতএব, আপনারা সকলে যাইয়া সেই গর্ভ সংশোধন করুন। আর এখন হইতে অনন্যমনে বামাদেবীর সেবা করিতে থাকুন।'

ইন্দ্রের আজ্ঞানুসারে দেবীরা তখনই বারাণসীতে যাইয়া ইন্দ্রের কথামত কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

কঃ পন্থা।

(শ্রীকমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য)

বর্ত্তমান ভারতে দেখা যায় ধর্ম্ম আর সমাজ বিষয় লইয়া তুমুল আন্দোলন চলিতেছে। অস্পৃশ্য জাতের লোকেরা স্মরণাতীত যুগ ধরিয়া তাহাদের নিজ অজ্ঞানতা বশতঃ যে ভাবে ব্রাহ্মণ-কায়স্থ প্রভৃতি উচ্চবর্ণের এবং অভিজাত বংশের ঘৃণা ও হেয় দৃষ্টি দ্বারা মাথা হেঁট করিয়াছিল, এখন আর সেদিন নাই। বর্ত্তমান শিক্ষা বিস্তার দ্বারা তাহারা ক্রমে ক্রমে জাগিয়া উঠিতেছে এবং তাহাদেরও যে আত্মসম্মান আছে ইহাও তাহারা ক্রমে বুঝিয়া উঠিতেছে। ব্রাহ্মণ ও গুরুপুরোহিতে পূর্ব্বের মত এখন নিম্ন কি নিম্নতর শ্রেণীর শ্রদ্ধা-ভক্তি নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। পূর্ব্বে যেরূপ ধর্ম্মশাস্ত্রসকল কেবল ব্রাহ্মণের নিজস্ব ছিল, শূদ্রেরা তাহা পাঠ করা দূরে থাক, দেখিতেও পাইতেন না, এখন যুগপ্রভাবে মুদ্রাযন্ত্র বিস্তারিত হওয়ায় এমন কোন শাস্ত্রই বাকী নাই যাহা প্রকাশ হইতেছে না। যে ব্রহ্মগায়ত্রী ব্রাহ্মণ ব্যতীত শূদ্রকে শুনাইতেও কঠোর নিষেধাজ্ঞা ছিল, আজ তাহা মুসলমান কম্পোজিটারেরাও কম্পোজ করিয়া ছাপাইতেছেন। এখন নিম্নতর অনেক অস্পৃশ্যবর্ণের শিক্ষিত লোকেরা ঘরে ঘরে ছাপা পুস্তক ক্রয় করিয়া বেদ-গায়ত্রী পাঠ করিতেছেন, এ অবস্থায় পূর্ব্বের দিন কি এখনও আছে ধরা যায়? তথাপি দেখিতেছি, কম্বলকে ছাড়িয়া দিলেও যেমন কম্বল ছাড়ে না, সেইরূপ উচ্চবর্ণের অহঙ্কার এবং জাতিভেদ আমাদের গিয়াও যাইতেছে না; ফলে অস্পৃশ্যতা নিবারণ হয় না।

কলিকাতায় যে হিন্দু মহাসভা বসিয়াছিল তাহাতে যে সকল প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, উহার মধ্যে হিন্দু, মুসলমান এবং খৃষ্টান প্রভৃতি অন্যান্য ধর্ম্মসম্প্রদায় কিরূপে এক ধর্ম্মমতে মিলিতে পারে তাহার একটীও খাঁটী প্রস্তাব দেখিলাম না। ফলে আমাদের স্বরাজ-আশা যেন বহুদূরে, এমন মনে হইতেছে। আমরা আবহমানকাল কেবল ধর্ম্মের বাদানুবাদ এবং তাহা লইয়া সম্প্রদায়গঠন ও জাতিভেদ সৃষ্টি করিয়া পরস্পরের ধর্ম্ম, সমাজ, আচার-ব্যবহারাদির নিন্দা করিয়া যেরূপ ভাবে কাল কাটাইয়া আসিতেছি সেই ভাবেই তো আছি, ইহার পরিবর্ত্তন হইতেছে কোথায়? বর্ত্তমান মুসলমানেরা হিন্দুকে মুসলমান করিতে চেষ্টা করিতেছে; অপরদিকে ভিতরে ভিতরে খৃষ্টানেরা বহুদিন ধরিয়া অস্পৃশ্য আর ম্লেচ্ছ বলিয়া ঘৃণিত হিন্দুদিগকে খৃষ্টধর্ম্মভুক্ত করিয়া লইতেছে। কিন্তু বর্ত্তমানে হিন্দুসমাজের চৈতন্যোদয় হইয়াছে, তাই হিন্দুরা এখন আর্য্যসমাজকেও হিন্দুসমাজভুক্ত করতঃ মুসলমান আর খৃষ্টানকেও পুনরায় হিন্দুদলে আনিতে চেষ্টা করিতেছেন। হিন্দুমহাসভায় সেই প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। এখন দেখিতেছি, হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টানের মধ্যে কেবল দল পুষ্টি করা লইয়া যুদ্ধ চলিতে থাকিবে। মুসলমান ও খৃষ্টানেরা হিন্দুকে আহ্বান করিবে—তোমরা যদি স্বরাজ চাও, আমাদের ধর্ম্ম গ্রহণ কর; তখন আমরা এক হইতে পারিব। অপরদিকে হিন্দুরা বলিতেছে—হে ভাইসকল,

---

* প্রত্যেক তীর্থঙ্কর জন্মগ্রহণ করিবার ছয়মাস পূর্ব্ব হইতে জন্মগ্রহণের নয়মাস পর পর্য্যন্ত তাঁহার জন্মস্থানে রত্নবৃষ্টি, পুষ্পবৃষ্টি, সুগন্ধি সলিলবৃষ্টি, দুন্দুভিবাদ্য এবং দেবগণ কর্ত্তৃক জয় জয় শব্দ হইয়া থাকে। ইহারই নাম পঞ্চাশ্চর্য্য। তীর্থঙ্করগণ দীক্ষাগ্রহণ করিবার পর প্রথম যে শ্রাবকের গৃহে আহার গ্রহণ করেন তাহার গৃহেও এইরূপ পঞ্চাশ্চর্য্য হইয়া থাকে—ইহাই জৈনদিগের বিশ্বাস।

† জৈনমতে তীর্থঙ্করের মাতা তীর্থঙ্করের জন্মের পূর্ব্বে ষোলটী স্বপ্ন দেখিয়া থাকেন। সেই স্বপ্ন হইতেই বুঝা যায় যে তাঁহার গর্ভে তীর্থঙ্কর জন্মগ্রহণ করিবেন। এই স্বপ্নে তীর্থঙ্করমাতা শ্বেতহস্তী, বৃষ, সিংহ, পূর্ণচন্দ্র প্রভৃতি ষোলটী জিনিস প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন।

তোমরাও তো হিন্দু ছিলে, তোমাদের পূর্ব্বপুরুষের খবর রাখ, সকলেই হিন্দু ছিলে—তার ভুল নাই। আমাদের দৈবদুর্ব্বিপাকবশতঃ ভারতরাজ্য প্রথমে মুসলমানেরা অধিকার করিয়া বলে-ছলে তোমাদিগের পিতৃপুরুষগণকে মুসলমান করিল; কেবল মুসলমান করা হইল—তাহা নহে, তোমাদের গোত্রানুযায়ী নাম পর্য্যন্ত বিস্মৃতির উদরে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হইল। ইহা দ্বারা তোমরা যে এদেশের লোক তাহার পরিচয় পর্য্যন্ত পাওয়া কঠিন হইয়া উঠিল। বর্ত্তমান খৃষ্টান মিশনারিরাও, হে খৃষ্টান ভ্রাতৃগণ, তোমাদিগকে যে খৃষ্টান করিতেছে, তোমাদের পূর্ব্বপুরুষের নাম-গোত্র ধ্বংস করিতেছে। কালে যাহা করে তাহা নিবারণ করা অসাধ্য। হিন্দুর দুরদৃষ্ট বশতঃ তোমরা খৃষ্টান হইয়া গেলে; এখন তোমাদিগকে ডাকিতেছি তোমরা শুদ্ধ হইয়া পুনরায় হিন্দুদলে প্রবেশ কর।

এই গেল বর্ত্তমান হিন্দুর কথা। ইহার প্রত্যুত্তরে মুসলমান আর খৃষ্টানেরা কি বলে তাহা শুনুন। এক-ঈশ্বরবাদী ইশ্লামধর্ম্মাবলম্বী মুসলমানেরা বলে—মানুষের আকাঙ্ক্ষা মানুষের সঙ্গে বাস করা, ইহা স্বাভাবিক; আমরা হিন্দুস্থানে মানুষের সঙ্গে বাস করিতে প্রথম আরব হইতে আসিয়াছিলাম। আসিয়াছিলাম এই আকাঙ্ক্ষা লইয়া যে, এক-ঈশ্বরবাদ ইস্লামধর্ম্ম ভারতে প্রচার করিয়া দেশকে পবিত্র করিব। আসিয়া দেখিলাম যে, খোদাতাল্লার প্রেরিত মহাপুরুষ মহম্মদ রসুল আবির্ভাব হওয়ার পূর্ব্বে আরবেরা যেরূপ পৌত্তলিক ছিল, ভারতও তাই; এখানে সকল লোকে এক খোদাতাল্লাকে পূজা করে না, নানা উপদেবতার পূজা করে; এক ঈশ্বরকে মানাইবার জন্য আমরা ভারত অধিকার করিলাম বটে, কিন্তু জানিতে পারি নাই যে, মুসলমানের সঙ্গে একত্রে বাস করিলে, মুসলমানের স্পৃষ্ট জল খাইলে এবং মুসলমানকে স্পর্শ করিলেও হিন্দুর জাত যায়। আমরা যুদ্ধক্ষেত্রে হাজার লোককে কয়েদ করিয়া তাহাদিগকে প্রাণ বাঁচাইবার জন্য পান-আহার করাইয়া যখন ছাড়িয়া দিলাম, তখন তাহাদিগকে হিন্দুরা গ্রহণ করিল না, কাজেই তাহারা মুসলমান হইয়া গেল। যখন দেখিলাম হিন্দুকে স্পর্শ করিলে, হিন্দুকে জল খাওয়াইলে হিন্দুর জাত মরে, তখন হিন্দুর জাত মারিয়া মুসলমান করা অতি সহজ কথা ভাবিয়া আমরা প্রথম প্রথম অনেককে মুসলমান করিয়া ফেলিলাম। তোমরা জাত যাওয়া বা নাশ হওয়ার কুসংস্কারের দোষেই মুসলমান হইলে। তোমাদের যদি আর্য্য ঋষিদের সনাতন ধর্ম্ম থাকিত, আর তাঁহাদের মত যদি জাতিভেদ না থাকিত অর্থাৎ কথায় কথায় জাত পালাইয়া যাওয়া প্রথা না থাকিত তাহা হইলে তোমাদের সহিত আমাদের কোন বিভিন্নতা থাকিত না; সে অবস্থায় তোমাদিগকে মুসলমান করিত কে, আর তোমাদের লোকই বা মুসলমান হইত কেন? তোমরা উচ্চ নীচ-ভাবে মানুষকে নানা ভাগে বিভাগ কর এবং মানুষকে মানুষ স্পর্শ করিলেও স্নান কর; মানুষকে মানুষ হইয়া এমন ভাবে ঘৃণা কর যে, কুকুর-বিড়ালকেও মানুষ তেমন করে না। এ অবস্থায় তোমাদের ঘৃণিত নিম্নতর শ্রেণীর লোকেরা আমাদের ধর্ম্মের উদারতা দেখিয়া আমাদের ধর্ম্মগ্রহণ করিতেছে, দোষ কাহার? দুর্ব্বৃত্ত দুরাত্মা, পাপাশয়, পাষণ্ড লোক সকল সমাজে সকল জাতির মধ্যে আছে; তাহারা আল্লার বিরোধী,—কোন ধর্ম্মাবলম্বী নয়। এ প্রকার মুসলমাননামধারী লোকেরা যদি হিন্দুর উপর কি স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচার করিয়া থাকে তবে তাহারা পবিত্র ইস্লামধর্ম্মের নামে কলঙ্ক আনিয়াছে সত্য, কিন্তু আপনারা চিন্তা করিয়া দেখিবেন, এই দোষ ইস্লামধর্ম্মের নয়। এই পাষণ্ডদের উদাহরণ দেখিয়া আপনারা মুসলমানদের উপর দোষারোপ করিবেন না। আপনারা যে, পূর্ব্বে যে সকল হিন্দু মুসলমান হইয়াছিল এখন তাহাদিগকে হিন্দুধর্ম্মে আনিতে চাহেন এবং আর্য্যসমাজ কতকগুলিকে শুদ্ধ করিয়া আনিয়াছে, আপনাদের ব্রাহ্মণ-কায়স্থ এবং বৈদ্য আদি উচ্চবর্ণের লোকেরা তাদের সঙ্গে মুক্তভাবে একত্র পান-ভোজন করিবেন কি, আর বিবাহাদি আদান-প্রদান চালাইবেন কি? আমাদের বিশ্বাস, তাহা কখনও হইবে না। আপনাদের যে পর্য্যন্ত 'জাত যাওয়া' ভয় এবং নানা ধর্ম্ম থাকিবে, সে পর্য্যন্ত কিছুই হইবে না, মিথ্যা বাগাড়ম্বর মাত্র এবং আমাদের সঙ্গে অনর্থক ঝগড়া বাধাইতেছেন।

অপর দিক হইতে দেশীয় খৃষ্টানেরা বলিতেছেন—হিন্দুধর্ম্ম নানা প্রকার পৌত্তলিক আবর্জ্জনাপূর্ণ। ইহাতে আদিম অসভ্য জাতিরও ধর্ম্ম আছে,—মেচ, গারো, নাগা, সাঁওতাল. ভীল, কোল প্রভৃতি অসভ্যজাতির লোকেরা যেরূপ নদী, পর্ব্বত, পাথর বৃক্ষাদির পূজা করিয়া থাকে হিন্দুরা তাহাও করে। হিন্দুধর্ম্ম মোটের উপর একটা খিচুড়িধর্ম্ম বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; আবার নানা সম্প্রদায়ের নানা দেবতা, নানা ধর্ম্ম, তৎসঙ্গে অসংখ্য জাত এবং জাতিভেদ; আমরা খৃষ্টান হইয়া একধর্ম্মী হইয়া পড়িয়াছি। লোকগণনা তালিকায় দেখা যায়, মুসলমান বলিলে একটি মাত্র জাত আর খৃষ্টান বলিলেও তাহাই; কিন্তু হিন্দু বলিলে অসংখ্য জাত এবং অসংখ্য ধর্ম্ম বুঝায়; এই হেতু পরস্পরের প্রতি ঘৃণা দ্বেষ ও হিংসা। আমাদিগকে নিম্নশ্রেণী হিন্দু

বলিয়া পূর্ব্বে হিন্দুসমাজ ঘৃণার চক্ষে দেখিতেছিল; তাই আমরা খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিলাম। আমরা এমন ঘৃণিত ছিলাম যে, উচ্চবর্ণের লোকেরা আমাদিগের ছায়া স্পর্শ করিলেও স্নান করিত। কিন্তু যে অবধি আমরা খৃষ্টান হইলাম এবং সুন্দররূপে শিক্ষালাভ করিলাম, তখন হইতে আমাদিগকে তোমরা সম্মান করিতে আরম্ভ করিলে; এখন যদি পুনরায় হিন্দুধর্ম্মে যাই তবে পূর্ব্বের ন্যায় আমাদিগকে হীনজাতিতে নামাইয়া রাখিবে। তোমাদের ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণেরা কখনও আমাদের সঙ্গে একত্র বসিয়া আহারবিহার করিবে না।

এ প্রকার অবস্থায় এখন দেখিতেছি, যে পর্য্যন্ত আমাদের বৃথা জাত্যভিমান থাকিবে সেই পর্য্যন্ত মুসলমান-খৃষ্টান কেহ আমাদের সঙ্গে মিশিবে না—আর আমরাও মিশিতে পারিব না। আমাদের এখন কি করা কর্ত্তব্য, আমাদের হিন্দুনেতাদিগের অতি সাবধানতার সহিত তাহা চিন্তা করিয়া দেখা উচিত। বর্ত্তমানে হিন্দুধর্ম্ম যেরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে হিন্দুধর্ম্ম 'কিমাকার কি প্রকার' এই বিষয় লইয়া যদি চিন্তা করিয়া দেখা যায়—কিছুই নির্ণয় করা যায় না; কারণ বৈদিকযুগে এবং বৌদ্ধযুগে, ধর্ম্মের নাম হিন্দুধর্ম্ম ছিল না। তখনকার হিন্দুধর্ম্মের নাম সনাতনধর্ম্মই ছিল। বৌদ্ধযুগের পর সনাতনধর্ম্মের নাম হিন্দুধর্ম্ম হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। এই হিন্দুধর্ম্ম এখন দেখিতে গেলে নানাপ্রকার আচার-ব্যবহার, খাওয়াদাওয়া, চলন-ফিরণ এবং অনুষ্ঠানাদিতেই পর্য্যবসিত; কাজেই এক প্রদেশের হিন্দুধর্ম্মের সহিত অপর প্রদেশের হিন্দুধর্ম্ম অনেকাংশে মিলে না ইহা কে অস্বীকার করিবে? বৌদ্ধযুগের পর হিন্দুদিগের অধঃপতন ক্রমে ক্রমে ঘটিয়া আসিতেছিল; সেই সময় হইতেই দ্রাবিড় প্রভৃতি অনার্য্য জাতিদিগের নানা উপধর্ম্ম একত্র হইয়া সনাতনধর্ম্মের সহিত মিশিয়া গেল; ইহাকেই কি হিন্দুধর্ম্ম বলিব? যদি এবম্প্রকার ধর্ম্মকেই হিন্দুধর্ম্ম বলা যায় তাহা হইলে এক প্রদেশের ধর্ম্মোৎসবের সঙ্গে অপর প্রদেশের ধর্ম্মোৎসবও মিলে না আর ধর্ম্মও মিলে না কেন? যদি খাদ্যাখাদ্য-বিচার ও আচার-ব্যবহার আদি পদ্ধতিকেই হিন্দুধর্ম্ম বলা যায় তখন আর এক প্রকার গোলোকধাঁধা আসিয়া উপস্থিত হয়; ইহাতেও তো এক প্রদেশের সহিত অপর প্রদেশের হিন্দুধর্ম্ম মিলে না। আসামে ব্রাহ্মণ-কায়স্থ ব্যতীত অপর সকল উচ্চ জাত এবং নিম্নতর বর্ণের হিন্দুদিগের মধ্যে অতি পূর্ব্বকাল হইতে যৌবনবিবাহ এবং বিধবাবিবাহ প্রচলিত আছে; বঙ্গদেশে হইলে তাহাদের সঙ্গে জল পর্য্যন্ত চলিত না। আসামে মহাপুরুষীয়ারা মূর্ত্তিপূজা মানে না। বঙ্গ এবং আসাম প্রদেশের ব্রাহ্মণ হইতে নিম্নতর বর্ণের লোক পর্য্যন্ত সাধারণত আমিষভোজী; উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের এবং বম্বে মান্দ্রাজ প্রভৃতি প্রদেশের উচ্চ বর্ণের হিন্দুরা আমাদিগকে এই আমিষ ভোজনের দরুণ অহিন্দু বলিয়া বিবেচনা করে; অতএব দেখা যায়, হিন্দুধর্ম্ম প্রত্যেক প্রদেশেরই পৃথক। হিন্দু মহাসভা যে কোন্ হিন্দুধর্ম্ম লইয়া ভারতের সমস্ত হিন্দুকে একত্র করিতে চাহেন তাহা বুঝিতে-পারিলাম না। এক সত্যধর্ম্ম ভিন্ন কোন জাতি একত্রিত হইতে পারে না। এই হেতু হিন্দুধর্ম্মের মূল তথ্য অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য।

সত্যযুগে ঋষিরা নৈমিষারণ্যে এবং ত্রেতাতে যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি তত্ত্ববিৎ মহর্ষি-রাজর্ষি যে সত্যধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন তাহাকে যদি হিন্দুধর্ম্ম বলা যায়, তাহা হইলে পৃথিবীর কোন জাতির সঙ্গে ধর্ম্ম লইয়া কোন বিবাদ থাকে না; বরঞ্চ পৃথিবীর সকল জাতির লোকেরা এই সত্যধর্ম্ম গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইবে। স্বামী বিবেকানন্দ ইউরোপ-আমেরিকাতে গিয়া যে হিন্দু-ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, সেই ধর্ম্ম যদি বর্ত্তমান ভারত হইতে পৃথিবীতে প্রচারিত হয় তাহা হইলে কালে সকল লোকেই হিন্দুধর্ম্মে আসিতে পারে। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়, হিন্দুধর্ম্মের যে মূল সত্য আবিষ্কার করিয়া খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করার পথ বন্ধ করিয়াছিলেন, যে ধর্ম্মকে বিশ্লেষণ করিয়া বুঝাইবার জন্য মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সমস্ত জীবন খাটিয়া সকল উপনিষদের সার সংগ্রহ-পূর্ব্বক সংস্কৃত হইতে বঙ্গানুবাদ করিয়া সর্ব্বসাধারণকে বুঝাইবার ত্রুটি করেন নাই—সকল ধর্ম্মের সেই সার তত্ত্ব হিন্দু পণ্ডিতেরা জগতকে বুঝাইবার জন্য যদি চেষ্টা করেন, তাহা হইলে হিন্দুর সঙ্গে কোন ধর্ম্মেরই বিবাদ থাকে না। খাঁটী হিন্দু ধর্ম্ম যাহাকে বলে আমি বুঝি সেটী বৈষ্ণবধর্ম্ম (প্রচলিত বৈষ্ণব ধর্ম্ম নহে); বিষ ধাতুর মানে যিনি সমস্ত ভূতেতে, এবং অণু-পরমাণুতে ওতঃপ্রোত ভাবে প্রবেশ করিয়া রহিয়াছেন, যিনি ব্রহ্ম—সেই একমেবাদ্বিতীয়ম্ মহান্ পরমেশ্বরকে জানাই মানুষের ধর্ম্ম; কারণ মানুষ তাঁহাকে জানিতে এবং তাঁহার মহিমা প্রচার করিতে জগতে আসিয়াছে। মানুষকে মানুষ সেবা করিতে আসিয়াছে, মানুষের উপর মানুষ প্রভুত্ব করিতে আসে নাই। এই বিশুদ্ধ ধর্ম্মের মত ধরিয়া মধ্যযুগে আসামের বৈষ্ণব ধর্ম্মপ্রচারক মহাপুরুষ শ্রীশঙ্করদেব যে ভাবে বৈষ্ণব-ধর্ম্মসঙ্ঘ গঠন করিয়াছিলেন সেইভাবে যদি বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্ম-সঙ্ঘ গঠন করিয়া ধর্ম্মপ্রচার করা যায়, তাহা হইলে সব ধর্ম্ম এক হইয়া পড়ে। মিকির, গারো, নাগা, মিরি, ভোট, ডোম, হাড়ি এবং মুসলমান কাহাকেও শ্রীশঙ্করদেব তাঁহার ধর্ম্মসঙ্ঘ হইতে বাদ দেন নাই। 'আতৈ' শব্দ আসামী ভাষায় আত্মীয় বা এক আত্মাকে বুঝায়; শ্রীশঙ্করদেবের বৈষ্ণব-

সঙ্ঘের আতৈ উপাধি অতি সম্মানজনক উপাধি, যেমন রোমান ক্যাথলিক সঙ্ঘের Reverend Father। শ্রীশঙ্কর দেবের প্রচারিত বৈষ্ণব ধর্ম্ম যে গারো গ্রহণ করিয়াছিল তাহার নাম হইয়াছিল গোবিন্দ আতৈ; অসভ্য নাগার নাম ছিল নরোত্তম আতৈ, ভোটের নাম ছিল দামোদর আতৈ, পার্ব্বত্য মিরির নাম ছিল নারায়ণ আতৈ, এবং চান্দখাঁ মুসলমানের উপাধি ছিল জয়হরি আতৈ ইত্যাদি। শ্রীশঙ্কর দেব জাতিভেদের, প্রতিমা পূজার এবং তীর্থবোধে জলকে পবিত্র জ্ঞান করার পরম বিরোধী ছিলেন। তিনি এক শুদ্ধ চৈতন্য আত্মা হরিকে মানিতেন এবং তাঁহারই উপাসনা করিতেন। শ্রীশঙ্কর দেবের জীবনচরিত এবং তাহার শিক্ষা অন্য সময় প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

সাংখ্য-দর্শন।

(শ্রীগৌরীনাথ চক্রবর্ত্তী শাস্ত্রী)

মহর্ষি কপিল যে কোন্ সময় সাংখ্যদর্শন ভারতে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, তাহা বলা বড় কঠিন। ঐতিহাসিকদের মতে বৈদিক যুগের পরে সূত্রযুগ। এই সূত্রযুগেই সম্ভবতঃ সাংখ্যদর্শন প্রবর্ত্তিত হয়। ইহা যদি সত্য হয়, তবে ঐতিহাসিকদের নির্দ্দিষ্ট মতে বলিতে হইবে যে, সাংখ্যদর্শন খৃষ্ট শতাব্দীর অন্যূন ৭০০ সাত শত বৎসর পূর্ব্বে হইয়াছিল। মহাভারতে সাংখ্যমতের কথা অনেক স্থলে উল্লিখিত আছে। মহাভারত সূত্রযুগের পরবর্ত্তী গ্রন্থ ইহাও ঐতিহাসিকদের মত। মহাভারতে সাংখ্যের উল্লেখ আছে বটে—কিন্তু বেদান্তদর্শনের উল্লেখ কোন স্থলে স্পষ্টভাবে দেখা যায় না। মহাভারতপ্রণেতা মহর্ষি বেদ-ব্যাস বেদান্তদর্শনের রচয়িতা বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে, অথচ তাঁহারই রচিত মহাভারতে বেদান্তদর্শনের উল্লেখ নাই। ইহাতে বোধ হয়, মহর্ষি বেদব্যাস মহাভারতরচনার অনেক পরে বেদান্তদর্শন লিখিয়াছিলেন, অথবা বেদান্তদর্শনপ্রণেতা ব্যাস স্বতন্ত্র ব্যক্তি। বেদান্তদর্শন-রচয়িতা ব্যাসের নামের পূর্ব্বে বাদরায়ণ বলিয়া একটী বিশেষণ পদ আছে। এই ব্যাপারটিও বেদান্ত-দর্শনের প্রণেতা ব্যাসকে মহাভারতের প্রণেতা ব্যাস হইতে পৃথক করিতেছে। ঠিক বলা যায় না; পাঠকবর্গ বিবেচনা করিবেন। দ্বৈপায়ন ব্যাস ও বাদরায়ণ ব্যাস দুইজন পৃথক ব্যক্তি হওয়াই খুব সম্ভব।

ফল কথা, সাংখ্যদর্শন দার্শনিক জগতের অতি প্রাচীন ও আদিগ্রন্থ। অন্যান্য দর্শনগুলি সাংখ্য দর্শনেরই ক্রমোন্নতি বলিলেই চলে। মহাভারতের সময় সাংখ্যদর্শনের বহুল প্রচার হইয়াছিল, সাংখ্যসম্প্রদায় গঠিত হইয়াছিল। মহাভারতের অনেক স্থলে বিশেষতঃ গীতা অংশে যে "সাংখ্য" কথাটির ব্যবহার হইয়াছে উহা সম্প্রদায়বাচক। সাংখ্যের পরেই মহর্ষি পতঞ্জলির যোগশাস্ত্র বা পাতঞ্জলদর্শন। এই দর্শনখানি সাংখ্যদর্শনের অনুবর্ত্তী—সাংখ্যেরই ক্রমবিকাশ। মহাভারতে যোগেরও বিষয় আছে। যোগশাস্ত্রও তখন ভারতে বিলক্ষণ প্রচারিত হইয়া সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছিল। "সাংখ্যৈঃ" এই কথাটি যেমন মহাভারতে অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়, তেমনি "যোগৈঃ" কথাটিও দেখিতে পাওয়া যায়। এই দুইটি তখন দার্শনিক সম্প্রদায় ছিল। অনেকে ঐ দুই সম্প্রদায়ের মত পরস্পরবিরুদ্ধ মনে করিতেন; কিন্তু বিরুদ্ধ যে নয়—তাহারও মীমাংসা মহাভারতে অনেক স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়।

> "যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্‌যোগৈরপি গম্যতে।
> একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥
> সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্‌বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ।
> একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্ব্বিন্দতে ফলম্॥"

নিরীশ্বর সাংখ্যবাদ ভারতে কোনওকালে অনাদরের জিনিস ছিল না;—পক্ষান্তরে ভারতের যাবতীয় ধর্ম্মসম্প্রদায় যাবতীয় সাধনপ্রণালী এই সাংখ্যবাদ অবলম্বন করিয়াই গঠিত হইয়াছিল। পুরাণে যে সকল দেবদেবীর কথা আমরা দেখিতে পাই সেগুলিও ঐ সাংখ্যদর্শন হইতে বিবৃত হইয়াছে। সাংখ্যকার ঈশ্বরকে অস্বীকার করেন নাই। তিনি ঈশ্বরকে খুঁজিয়া পান নাই। কিন্তু তিনি যে সকল সত্য প্রচার করিয়াছিলেন, পরবর্ত্তী দার্শনিকগণ সেই সকল সত্য হইতেই ঈশ্বরকে খুঁজিয়া বাহির করিয়াছিলেন।

যে তত্ত্ব সেই প্রাচীনকালে মহর্ষি কপিল তাঁহার শান্তিপূর্ণ আশ্রমে বসিয়া আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন, তাহা এক অপূর্ব্ব রহস্য। তিনি জগতকে এক অভিনব আলোক দিয়া গিয়াছেন। এই তত্ত্ব যে তাঁহার সময়েই কেবল নূতন বলিয়া আদৃত হইয়াছিল, তাহা নহে; ইহার নূতনত্ব অদ্যাবধি যায় নাই। যতই তাঁহার এই অদ্ভুত চিন্তাশক্তিপ্রসূত তত্ত্ব আলোচিত হইতেছে ততই ইহার আদর বিশ্বব্যাপী হইয়া পড়িতেছে, ইহার নব আলোকে দার্শনিক জগত মোহিত হইতেছে। পাশ্চাত্য জগতে এই দর্শনের গূঢ় রহস্যগুলি লইয়া দার্শনিকদের মধ্যে হুলস্থূল ব্যাপার উপস্থিত হইয়াছে। তাঁহারা যখন এই তত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তখন ইহা হইতে যে অচিরে শুভ ফল ফলিবে তাহার কোন সন্দেহ নাই।

এই সাংখ্যদর্শনের গূঢ় তত্ত্বগুলি এতই গভীর ও

এতই দুরূহ যে বহু আলোচিত হইয়াও ইহা প্রাঞ্জলাকারে সর্ব্বসাধারণের বোধগম্যের বিষয় আজ পর্য্যন্ত হয় নাই। ভারতে প্রাচীন ঋষিগণ ইহার আলোচনা করিয়াছিলেন। তাঁহারা সাধারণের বোধগম্য করিবার জন্য পুরাণাদিতে রূপকাকারে এই তত্ত্বগুলি প্রচার করিয়াছেন। কালক্রমে তাহার ফল এই হইয়াছে যে, ঐ রূপকগুলি প্রকৃত বস্তুর মতন হইয়া গিয়াছে এবং সাধারণ পাঠক তাহার প্রকৃত অর্থ অনুসন্ধান না করিয়া রূপকার্থ গ্রহণ করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকেন। পুরাণের পরবর্ত্তী টিপ্পনীকারগণের হাতে পড়িয়া ইহার আর এক অবস্থা ঘটিয়াছে। টিপ্পনীকারগণের সময় ভারতে ন্যায়শাস্ত্রের চর্চ্চা অধিক পরিমাণে হইয়াছিল। যাহা কিছু বিদ্যা, তখন সমস্তই ন্যায়মূলক ছিল। ন্যায়ের রঙে রঞ্জিত করিতে পারিলেই বিদ্যার পরাকাষ্ঠা হইত। ন্যায়ের ছাঁচে ফেলিয়া ন্যায়ের ভাষায় যাহা কিছু লিখিত হইত, বিদ্বৎসমাজে তখন তাহারই অধিক আদর ছিল। ন্যায়ের দিকে লক্ষ্য থাকিলেই তর্কের আবশ্যক হইত—তর্ক উঠিত—অযথা তর্কও উঠিত; আসল বস্তুর প্রতি লক্ষ্য কমিয়া গিয়া অবান্তর-কথা লইয়া অনেক তর্ক হইত। দর্শনশাস্ত্রগুলি এইরূপে নৈয়ায়িকতায় পূর্ণ হইয়া রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়াছিল। ইহার ভিতরে যে গূঢ় তত্ত্বগুলি নিহিত আছে তাহার প্রতি আর বড় লক্ষ্য থাকে নাই। সূত্রগুলির অভিধা বা শাব্দিক অর্থ লইয়াই তর্কবিতর্ক চলিয়াছিল।

দার্শনিক ভাষায় প্রমা ও প্রমেয় দুইটি কথা আছে। দ্বিতীয়টির অর্থ গূঢ় ও প্রকৃত মর্ম্ম, প্রথমটির অর্থ প্রমাণ বা তর্ক। টিপ্পনীকারদের লিখিত গ্রন্থগুলিকে ঐ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। উপরে যে ন্যায়ের তর্কের কথা বলা হইল প্রমাগ্রন্থগুলি ঐ ন্যায় অবলম্বনে লিখিত। ইহাদের সংখ্যাই অধিক। পণ্ডিতমহলে ঐ গুলিরই আদর। প্রমেয় গ্রন্থের সংখ্যা অধিক নহে। ঐ জাতীয় গ্রন্থের আলোচনা সাধক অর্থাৎ সাধুসন্ন্যাসীদের মধ্যে কিছু কিছু আছে। ফলকথা কালক্রমে টিপ্পনীকারদের হাতে পড়িয়া দর্শনের বস্তুচিন্তা চলিয়া গিয়া বস্তুবিচার বাড়িয়া গিয়াছিল।

এই অবস্থায় এখন সাংখ্যদর্শন আমাদের নিকট উপস্থিত আছে। অন্যান্য দর্শন অপেক্ষা সাংখ্যের অবস্থা আরও মন্দ, এইজন্য মহর্ষি কপিলের সূত্রগুলি পর্য্যন্তও লোপ হইয়া গিয়াছে; শিষ্যপরম্পরা-রচিত-সূত্র বা কারিকাগুলি মাত্র পাওয়া যায়।

ভারতের এই অমূল্য নিধির পুনরুদ্ধার যথাসম্ভব নিতান্ত আবশ্যক। চিন্তাশীল মনীষীগণ যদি এই বিষয় মনোযোগ করেন তবে কতকটা সুফল ফলিবার সম্ভাবনা। ইয়ুরোপীয় মনীষীগণের এই বিষয়ে লক্ষ্য পড়িয়াছে সত্য, কিন্তু ভারতের জিনিষ ভারতবাসীর হাতে যেমন সুন্দর ও স্বাভাবিক ভাবে প্রকাশিত হইবে বিদেশীর হাতে বিদেশীয় আবহাওয়ায় তেমন হইবার সম্ভাবনা কম। এই দর্শনের আবিষ্কৃত সত্যগুলি যদি প্রাঞ্জল ও সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যাত হয় তবে ইহা জড়-বৈজ্ঞানিক ও মনোবৈজ্ঞানিক জগতে এক অভিনব-যুগ অবতারণা করিবে।

অভিভাষণ। *

(মহারাজা শ্রীজগদিন্দ্রনাথ রায়)

সমাগতপ্রায় জীবন-সন্ধ্যায় নিজ আবাস-গৃহের নিভৃত নেপথ্যে নীরবে বসিয়া যখন দিনাতিপাত করিতেছি, তখন একদিন অকস্মাৎ বিক্রমপুরের বিদ্বজ্জনমণ্ডলীর নিকট হইতে আহ্বান আসিল—সেন, শূর ও পাল নরপালগণের কীর্ত্তিকলিত যে বিক্রমপুর, দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশের জ্ঞানালোকোদ্ভাসিত যে বিক্রমপুর, মহম্মদী বক্তিয়ার কর্ত্তৃক বিহার-বঙ্গ-বিজয়ের শতাধিক বর্ষ পর পর্য্যন্ত স্বাধীনতা রক্ষার প্রবল প্রচেষ্টায় বদ্ধপরিকর বিশ্বরূপ ও কেশবের যে বিক্রমপুর, শত-সমর-বিজয়ী মানসিংহের সহিত দ্বৈরথ যুদ্ধস্পর্শী, দিল্লীশ্বরের তন্দ্রাভঙ্গকারী চাঁদ কেদারের যে বিক্রমপুর, বঙ্গবাসীর পক্ষে তীর্থসদৃশ পুণ্যক্ষেত্র যে বিক্রমপুর, সেই বিক্রমপুর হইতে আহ্বান আসিল—আমাকে বিক্রমপুরবাসীর অনুষ্ঠিত বাণী-পূজার পৌরোহিত্য করিতে যাইতে হইবে। বিক্রমপুরবাসীর আহ্বানই যথেষ্ট, তদুপরি, আজ সমগ্র দেশের চিত্ত-রঞ্জন, চিত্তরঞ্জনের সস্নেহ আহ্বান আমার 'না' বলিবার পথ অবরুদ্ধ করিল; তাহার উপরে বহুদিনের অন্তরঙ্গ বন্ধু রমাপ্রসাদের প্রাহ্ণ সায়াহ্ন মধ্যাহ্ন নির্ব্বিশেষের নিয়ত আক্রমণ আমাকে গৃহে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছিল।

যে কার্য্যে আহূত হইয়াছি, জানি, আমি তাহার সম্পূর্ণ অযোগ্য; যে উপযোগিতা থাকিলে তরুণেন্দুকান্তিমতী, সিতসরোজ-সমাসীনা, বীণাবাদনপরা বাগ্দেবতার অর্চ্চনায় কোন প্রকার ভার গ্রহণ করা যায়, তাদৃশ উপযোগিতা আমার কিছুই নাই; যোগ্যতর ব্যক্তির প্রতি এ ভার ন্যস্ত হইলে আপনাদের অভিপ্রেত কার্য্য সুচারুরূপে নিষ্পন্ন হইতে পারিত সন্দেহ নাই। যে পদ দ্বিজেন্দ্রনাথ, হরপ্রসাদ, প্রফুল্লচন্দ্র, অক্ষয়চন্দ্র ও আশুতোষ প্রভৃতি ভুবন-বিশ্রুত-কীর্ত্তি মনীষিবৃন্দ অলঙ্কৃত করিয়াছেন, সেই সর্ব্বজনবাঞ্ছিত উচ্চপদ আমাকে গ্রহণ করিতে বলা

* ষোড়শ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন, মুন্সীগঞ্জ বিক্রমপুর মূল সভাপতি কর্ত্তৃক পঠিত।

আমার পক্ষে কি বিড়ম্বনা তাহা আমিই জানি, কিন্তু তথাপি আসিয়াছি কেন ? আসিয়াছি—বিক্রমপুরবাসীর আদেশ অমান্য করিতে পারি নাই, চিত্তরঞ্জন ও রমাপ্রসাদের ন্যায় বান্ধবজনের স্নেহের আহ্বান আমাকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করিয়াছে, তদুপরি গয়া গঙ্গা, বারাণসী বৃন্দাবন, অযোধ্যা পুষ্কর, সেতুবন্ধ কন্যাকুমারীর ন্যায় বঙ্গবাসীর নিকট পরম পুণ্য তীর্থ-সদৃশ বিক্রমপুর দেখিবার এ সুযোগ ত্যাগ করিতে পারি নাই। আপনাদিগের অনুষ্ঠিত বাণী-পূজা আপনারাই নিষ্পন্ন করিবেন ; বারি-আহরণ, মন্দির-মার্জ্জন, পুষ্পচয়ন প্রভৃতি দেবীপূজার সমগ্র আয়োজন আপনারাই করিবেন, "নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্" বলিয়া আমাকে ডাকিয়াছেন মাত্র—তদুপরি সাহিত্যের বিশেষ বিশেষ শাখা সকলগুণসম্পন্ন পণ্ডিতাগ্রগণ্যগণ সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন, সকল কার্য্য তাঁহাদের দ্বারাই সম্পন্ন হইবে—আমি কেবল এই মহা মহোৎসবে যোগদান করিয়া প্রসাদ-কণিকা লাভ করিব এই ভরসায় আসিয়াছি। আমার কর্ত্তব্যের মধ্যে স্খলন পতন ত্রুটি বিচ্যুতি যথেষ্টই থাকিবে। তবে যে অহৈতুকী প্রীতিবশে আমাকে আহ্বান করিয়াছেন, সেই প্রীতিবশেই আমার কৃত এবং অকৃত কার্য্যের দোষের জন্য আমি মার্জ্জনা পাইব সেই আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়া এখানে উপস্থিত হইতে সাহসী হইয়াছি। অযোগ্যের উপরে যাঁহারা গুরুভার অর্পণ করেন, দায়ীত্ব তাঁহাদেরই —অকিঞ্চনের সে ভরসাও কম ভরসা নহে।

ইতিহাস-বিশ্রুত বিক্রমপুরের সর্ব্ববিধ গৌরবের কাহিনী একমুখে বলিয়া শেষ করা যায় না ; সমগ্র উত্তর ভারতের একচ্ছত্র নরপাল পাল-ভূপালগণের সময় হইতে এই বিক্রমপুর গৌরবান্বিত। এই বিক্রমপুরের অন্তর্গত বজ্রযোগিনী গ্রামের দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশ ভারতে এবং ভারতের বাহিরে যশের যে জয়স্তম্ভ প্রোথিত করিয়া গিয়াছেন তাহা এই বিক্রমপুরকেই চিরধন্য করিয়া গিয়াছে। বৌদ্ধযুগের ধর্ম্ম ও বিদ্যাপীঠ জগতে অদ্বিতীয় 'বিক্রমশীলা'—সেই বিক্রমশীলায় যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অধ্যক্ষ ছিলেন তিনি এই বিক্রমপুরেরই দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান। জ্ঞানময় শ্রীজ্ঞানকে যখন চিরতুষারাবৃত তিব্বতদেশে মহা সমারোহে লইয়া যায়, তখন যে সমাদর যে সম্মানের সহিত তাঁহাকে তথায় লইয়া যাওয়া হয় তাহা শুনিয়াছি কোনও দেশে, কোনও কালে, কোনও রাজাধিরাজচক্রবর্ত্তী মহারাজার ভাগ্যেও ঘটে নাই, এবং আজ পর্য্যন্ত শ্রীজ্ঞানের নামোচ্চারণ মাত্র তিব্বতের অধিবাসীবৃন্দ সসম্ভ্রমে দণ্ডায়মান হইয়া পরলোকগত দীপঙ্করের উদ্দেশে যোড়করে হৃদয়ের ভক্তি-প্রীতি অবনত মস্তকে উর্দ্ধে প্রেরণ করিয়া থাকে। এ গৌরব সমগ্র গৌড় বঙ্গের কিংবা ভারতের হইলেও বিক্রমপুরেরই নির্ব্বর সামগ্রী।

দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্যের ন্যায় লক্ষ্মণসেন যখন গৌড়ের গৌরবময় সিংহাসনে সমাধিষ্ঠিত, যখন বিক্রমাদিত্যের সভার নবরত্ন পুনর্জ্জন্মলাভ করিয়া লক্ষ্মণের রাজসভায় জয়দেব, ধোয়ী, উমাপতি, শরণ, গোবর্দ্ধন, হলায়ুধরূপে বিরাজিত, তদানীন্তন ও তৎপরবর্ত্তী কালের একাধিক তাম্রশাসন হইতে জানিতে পারা যায় যে, এই বিক্রমপুরে লক্ষ্মণের জয়স্কন্ধাবার স্থাপিত হইয়াছিল। গৌড়ের রাজগৌরব এ স্থান পর্য্যন্ত বিস্তৃত না থাকিলে জয়স্কন্ধাবার স্থাপনের সার্থকতা থাকে না। এই জয়স্কন্ধাবার হইতেই মহারাজচক্রবর্ত্তী লক্ষ্মণসেন বিভিন্নগোত্রীয় বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করিয়া ব্রাহ্মণত্বের ও পাণ্ডিত্যের গৌরব বর্দ্ধিত করিয়াছেন। শ্রীচন্দ্রদেব, ভোজবর্ম্মা, হরিবর্ম্মার তাম্রশাসনও এই বিক্রমপুর জয়স্কন্ধাবার হইতে সম্পাদিত। এই সমস্ত ঐতিহাসিক প্রমাণ হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, লক্ষ্মণাবতীর মহা গৌরবান্বিত রাজছত্রের ছায়াতলে বিক্রমপুরের গৌরব এতদূর বর্দ্ধিত হইয়াছিল যে, কালের সর্ব্বধ্বংসী স্থূল হস্তাবলেপও বিক্রমপুরের সে প্রাচীন গরিমা আজও একেবারে বিলুপ্ত করিতে পারে নাই। আবার কৌমারে কলিঙ্গবিজয়গর্ব্বী, সত্যব্রত শান্তনুনন্দনের ন্যায় শরক্ষেপপটু, মহাবলপরাক্রান্ত চক্রবর্ত্তী নরপাল লক্ষ্মণের অবসানে মোসলেমবীর মহম্মদী বক্তিয়ার যখন উদ্দণ্ডপুরের বিহারস্থিত গ্রন্থরাশি ভস্মে পরিণত করিয়াছিল, লক্ষ্মণাবতীর সিংহদ্বার যখন স্বল্পায়াসে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল তখন লক্ষ্মণের বংশধর বিশ্বরূপ, কেশব প্রভৃতি বীরাগ্রগণ্য মহাপুরুষগণ স্বাধীনতা রক্ষাকল্পে বদ্ধপরিকর হইয়া যে ভূমিতে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন উহা এই বিক্রমপুরেরই পুণ্যময় পবিত্র ভূমি। শতাব্দী চলিয়া গিয়াছে, ধীরে ধীরে বিহার ও বঙ্গের বহু জনপদ মোস্লেমের অর্দ্ধচন্দ্রাঙ্কিত পতাকার নিম্নে মস্তক অবনত করিয়াছে, কিন্তু শীতলাক্ষ্যা, মেঘনা, ধলেশ্বরী ও পদ্মা পরিবেষ্টিত এই বিক্রমপুর তাহার গর্ব্বিত মস্তক অবনমিত করে নাই ; চতুর্দ্দিকে বিপুলকায় যে সকল নদনদী এই পুণ্যভূমিকে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছিল, তাহাদের উত্তালতরঙ্গ ও উন্নত স্রোতোবেগ উল্লঙ্ঘন করিয়া যবনসৈন্য ইহার সীমান্তেও উপস্থিত হইতে পারে নাই।

আবার সে আর একদিন ছিল, যে দিনে বঙ্গের জমীদার বারভৌমিকগণ তাঁহাদের বিপুল বলদৃপ্ত হস্তে শাণিত অসির মণিময় মুষ্টি ধারণ করিতেন, সে দিনে এই শ্রীপুর বিক্রমপুরের চাঁদ কেদার দিল্লীর মোগলসম্রাটের মুকুটমণি আকবর ও জাহাঙ্গীরের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়া-

হইয়া ছিলেন। "নহ্যমূলা জনশ্রুতিঃ" এই সংস্কৃত প্রবাদ একেবারে ভিত্তিহীন বলিয়া মনে হয় না। যদিও জনপ্রবাদের সহিত অনেক পত্র-পুষ্প-পল্লব সংযোজিত হয় বটে, তথাপি অনুসন্ধান করিলে তাহার মূলে সত্যের সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়। চাঁদ কেদারের বিষয়ে অনেক গল্পের সৃষ্টি হইয়াছে, বংশপরম্পরায় সেই সকল গল্প অনেক শাখা-পল্লবে সুশোভিত হইয়া উঠিয়াছে সত্য, কিন্তু তাহার মধ্যে অনুসন্ধান করিলে সত্য পাওয়া যায় না এ কথা বলিতে হইলে অতি বড় দুঃসাহসের প্রয়োজন। কিম্বদন্তী বলিয়া থাকে যে, যখন মহারাজ মানসিংহ বাদসাহ কর্ত্তৃক কেদারের বিদ্রোহ দমনে প্রেরিত হন, তখন কেদার "তথাপি সিংহঃ পশুরেব নান্যঃ" বলিয়া মানসিংহের গর্ব্বিত বচনের উত্তর দিয়াছিলেন; জনশ্রুতি আরও বলিয়া থাকে যে, মানসিংহ ও কেদারের দ্বৈরথ সমরে বঙ্গবীর কেদারের অসির আঘাতে রাজপুতকেশরী রাজা মানের হস্তধৃত তরবারি স্খলিত হইয়া ভূমিতে পড়িয়া যায়; ইচ্ছা করিলে কেদার তন্মুহূর্ত্তে মানের জীবলীলার অবসান করিয়া দিতে পারিতেন, কিন্তু বীরোচিত প্রথানুসারে বঙ্গের কেদার রাজপুতবীরকে পুনরায় অসি লইবার অবসর দিবার জন্য দূরে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। এ সকল কিম্বদন্তীর মধ্যে অতিরঞ্জন থাকিতে পারে, বিজ্ঞান-সম্মত ইতিহাসে ইহার স্থান না হইতে পারে, কিন্তু এইরূপ জনশ্রুতির মূল অনুসন্ধান করিলে অন্ততঃ এটুকু সত্য বাহির হইবে যে, দিল্লীশ্বর আকবর এবং জাহাঙ্গীরের রোষরক্ত লোচনের ভ্রূভঙ্গ দেখিয়া, কিম্বা কাবুল-কান্দাহারের বিদ্রোহদমনকারী, হলদিঘাটের সমরবিজয়ী রাজা মানের অসিফলকের দীপ্তি দেখিয়া বিক্রমপুরস্থিত শ্রীপুর-নিবাসী বাঙ্গালী বীর কেদার ভীত হইয়া দন্তে তৃণ করে নাই বা গলদেশে কুঠার বাঁধিয়া রাজপুত বীর মানের পদতলে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করতঃ বাঙ্গালার বীরত্বাভিমানকে পদ্মার স্রোতে ভাসাইয়া দেয় নাই।

লক্ষ্মণ সেনের রাজসভায় বসিয়া বাণী-নিকুঞ্জের কলকণ্ঠ পিক ভক্তশিরোমণি জয়দেব, যখন "মেঘৈর্মেদুরম্" বলিয়া সজল-জলদ গভীর কণ্ঠে শ্লোকাবৃত্তি করিতেন, কিংবা কোমল-মলয়-সমীরান্দোলিত, কোকিলকূজিত লবঙ্গ-লতিকার কুঞ্জকুটীরে রাধামাধবের মিলন-সঙ্গীত মধুর স্বরে গান করিতেন, পবনদেবকে দূত কল্পনা করিয়া অপ্সরীর প্রেমবেদনা মানবের নিকট নিবেদন করাইবার জন্য ধোয়ী কবি যখন তাঁহার অমৃতনিস্যন্দিনী অমর লেখনী ধারণ করিতেন, কিংবা প্রশস্তিকার উমাপতি যখন প্রদ্যুম্নেশ্বরের মন্দিরের উচ্চ চূড়াকে দিন-দেবতার মধ্যাহ্ন-বিশ্রামের স্থানরূপে কল্পনা করিয়াছিলেন, চিরপ্রোষিত অগস্ত্যকে দাক্ষিণাত্য হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার অনুরোধ জানাইয়া প্রণত বিন্ধ্যকে তাহার তুঙ্গশির ঊর্দ্ধে তুলিতে বলিয়াছিলেন, তখন বঙ্গের কি এক আনন্দময় গৌরবের দিনই গিয়াছে! বিলয় অভ্যুদয়, উত্থান ও পতন প্রকৃতির নিয়ম—লক্ষ্মণের রাজসিংহাসন-ছায়াতলে যে সাহিত্য-তরু জন্মলাভ করিয়া পত্র-পুষ্প-কিশলয়ে শোভাসম্পন্ন হইয়াছিল, বঙ্গের সংস্কৃত কাব্যের গৌরবের উহাই বোধ হয় শেষ দিন। তাহার পরে ন্যায়-দর্শনাদির চর্চ্চায় বঙ্গ গৌরবান্বিত হইয়াছে, কিন্তু কাব্য রচনায় সর্ব্বপ্রকার যশোলাভ তাহার পরে বোধ করি আর হয় নাই।

সংস্কৃত ভাষা সাধারণের ভাষা নহে, সমাজের স্তরবিশেষের কতিপয় ব্যক্তি যাহার অনুশীলনে আনন্দলাভ করিত, সে ভাষা সার্ব্বজনীন হইতে পারে না, সেই জন্য একদিন শিব সিংহের সিংহাসনতলে বসিয়া বিদ্যাপতি এক সুপ্রভাতে কলকণ্ঠে গাহিয়া উঠিলেন "গেলি কামিনী গজহু গামিনী, বিহসি পালটি নেহারি" অমনি শ্রোতৃবর্গ আনন্দে পুলকাঞ্চিত হইয়া উঠিল।

যে ভাষা জন্মমুহূর্ত্ত হইতে নিয়ত কর্ণরন্ধ্রে ধ্বনিত হইতেছে, যাহা শুনিতে শুনিতে শিশু তাহার কোমল জিহ্বায় তাহারই প্রতিধ্বনি করিবার জন্য পিঞ্জরস্থ বিহঙ্গের ন্যায় প্রাণপণ চেষ্টা করিতে থাকে, মাতৃকণ্ঠ যে ভাষা অকারণে অসীম স্নেহবেগে অর্থহীন সমাদরবাণী রূপে নিয়ত উচ্ছলিত হইয়া শিশুর কর্ণে অমৃতধারা বর্ষণ করিতে থাকে, জাতীয় সাহিত্যের ভাষা, প্রাণের কথা প্রকাশ করিয়া বলিবার একমাত্র ভাষা উহাই—ইহা প্রমাণ করিতে অধিক কথা বলিবার প্রয়োজন নাই, বাঙ্গালার বৈষ্ণব কবিগণের সমুদ্রতুল্য পদাবলী ও গীতিকাব্য প্রভৃতিই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

সংস্কৃত কাব্য সাহিত্য পুরাণেতিহাস, এমন কি দর্শন বিজ্ঞান প্রভৃতিও যেমন কবিতাবহুল, জয়দেবাদি হইতে আরম্ভ করিয়া বাঙ্গালার বৈষ্ণব সাহিত্যও তেমনি কবিতাবহুল, সমসাময়িক গদ্য সাহিত্য একরূপ নাই বলিলেও হয়। বঙ্গে মুসলমান অধিকার কালে বঙ্গ সাহিত্যের উন্নতিকল্পে চেষ্টা হইয়াছে, গৌড়েশ্বর হুসেন সাহের সময়ে বঙ্গসাহিত্যের পরিপুষ্টিকল্পে প্রয়াস হইয়াছে এবং তাহাতে একেবারে ফল ফলে নাই এ কথা বলা যায় না। তাহার পরে যে বাঙ্গলার গদ্য-সাহিত্য সৃজনের চেষ্টা তাহা প্রয়োজন উপলক্ষে। নবাগত ইংরাজ রাজপুরুষদিগকে কাজ চালাইবার মত বাঙ্গালা শিক্ষা দিবার জন্য ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতদিগের উপরে ভার পড়িল বাঙ্গালা গ্রন্থ রচনা করিবার। যাঁহারা সে ভার গ্রহণ করিলেন তাঁহারা সকলেই সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত। সে দিনে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত মহাশয়গণ বঙ্গসরস্বতীর

চরণারবিন্দে সভক্তি দৃষ্টিপাত করিতেন না, বরঞ্চ কৃপাপাত্রীজ্ঞানে মুষ্টিভিক্ষা দানের জন্য অবহেলায় কর প্রসারণ করিতেন। তাঁহারা মনে করিতেন যে, সংস্কৃত সরস্বতীর মণিময় মন্দিরের স্বর্ণ-প্রাঙ্গণে বসিয়া মহোৎসবের কণিকামাত্র প্রসাদ পাইলেই বঙ্গসারস্বতলক্ষ্মী ধন্য এবং কৃতকৃতার্থ হইয়া যাইবেন। সেই জন্য সংস্কৃত সাহিত্যের সুরম্য হর্ম্ম্যপ্রাঙ্গণে বঙ্গসরস্বতীর পর্ণকুটীর প্রস্তুত হইল এবং বহুল সমাস-খচিত স্থূল অবগুণ্ঠনে সরলা বঙ্গবাণীর আবক্ষ আচ্ছাদিত হইয়া গেল। বাঙ্গালায় গ্রন্থরচনা তাঁহাদের পক্ষে অগৌরবের কথা, সেই জন্য তাঁহারা কায়ক্লেশে কেবলমাত্র সংস্কৃতের বিভক্তিগুলি পরিবর্জ্জন করিয়া সমাসবহুল শব্দ গাঁথিয়া বাঙ্গালাগ্রন্থ রচনা করিতেন। ফলে হইল, যাঁহাদের শিক্ষার জন্য গ্রন্থ তাঁহারা কিছুই শিখিলেন না, এবং সে সকল গ্রন্থ পাঠে বাঙ্গালীর হৃদয় তৃপ্তিলাভ করিতে পারিল না। একদিকে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতগণের সমাসবহুল সংস্কৃতপ্রায় গদ্য, অপরদিকে কেরি,মার্শম্যান প্রভৃতির ফিরিঙ্গি বাঙ্গালা। গদ্যসৃষ্টির চেষ্টায় সৃজিত হইল 'গদ' ; যদি গদ শব্দের অর্থ পীড়া হয় তাহা হইলে যথার্থই পীড়াদায়ক হইয়াই বাঙ্গালার এই গদ্যসাহিত্য প্রথম দেখা দিল।

তাহার কিছুকাল পরে এই বাঙ্গালা দেশের সহিত যখন ইংরাজি সাহিত্যের পরিচয় হইল, যখন ইউরোপীয় কাব্য সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শনের সহিত বঙ্গদেশ পরিচিত হইল, ক্ষণজন্মা রামমোহন, বিদ্যাসাগর যখন গদ্যের সেই গলিপথ প্রশস্ত করিয়া দিবার জন্য নিজ নিজ চেষ্টাকে নিয়োজিত করিলেন, তখন বঙ্গীয় জনের আশা আকাঙ্ক্ষা দিন দিন বর্দ্ধিত হইয়াই চলিল, তখন পয়ার নাচালী আর আমাদিগকে নাচাইতে পারিল না, তখন "গুলে বকাউলী"র তর্জ্জমায় আর আশা আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি হইল না। তখন কি চাই তাহা জানি না, কিন্তু যাহা পাইয়াছি বা পাইতেছি তাহাতে তৃপ্তি হয় না—এমন দিনে, কারণাধীনে মধুসূদনের শর্ম্মিষ্ঠা, কৃষ্ণকুমারী আসিয়া দেখা দিল। তখন একদিকে কৃষ্ণগৃহীতমানসা ব্রজাঙ্গনার প্রাণের বেদনা এবং বীরাঙ্গনার প্রিয় সম্মিলনের একান্ত উদগ্র আকাঙ্ক্ষা, অপর দিকে মেঘনাদের রণতূর্য্যের গভীর নাদ। *

নূতন ব্রহ্মসঙ্গীত।

রাগিণী দরবারী কানাড়া—তাল ঝাঁপতাল।

তাঁহারে দেখ অন্তরে হে নর—
কাটায়ো নাকো বৃথা জগতে
জীবন ওরে মূঢ় জনের।
এই ভবসাগর পার হবে তাঁহারি নামে—
তিনি সেতু বিধরণ—
গোচর ধ্যানের।
চরণে তাঁরি দাও চিত সঁপিয়া—
পাও সুন্দর পুণ্যধাম
দুরলভ সুরগণের।
যুগে যুগে অটল হৃদয়ে
ধাও তাঁহারি পান—
জয়গীত শত কণ্ঠে গাও
মহেশের॥

ক্ষি. না. ঠা.

খাম্বাজ

বংশী-ধ্বনি গো তোমার
বাজিছে হৃৎবৃন্দাবনে।
মগ্ন বধির যেন করমে বৃথা—
তব না শুনি' আহ্বান।
রহিয়া রহিয়া মরমেতে
জাগে যেন দামিনী চমকিত
নাম তব—নারে ধরি'
বাঁধিবারে মম পরাণ॥
এস হে এস চিদাসনে
আদিত্যবরণ অরূপ অতনু!
ভক্তি দাও শক্তি দাও—
কলুষহরণ নাথ হে ;
চরণ ধরিয়া যাহে উতরিতে
পারি ভবসিন্ধু,
তব নয়নে রাখি' হে
অনিমেষ দুই মম নয়ান॥

ক্ষি. না. ঠা.

ঝিঁঝিট বেহাগ—আড়াঠেকা।

হৃদয়ে মোর এসো—
তব চরণে প্রাণ ধাইছে হে।
জগত ভরিয়া নামি'
তোমারি প্রেম
আকুল করি' দি'ছে হে॥

ক্ষি. না. ঠা.

অসমীয়া বৈষ্ণব বনমালী দেব ও বংশীগোপাল দেব।

(আসামপর্য্যটক—শ্রীবিজয়ভূষণ ঘোষ-চৌধুরী)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

দেবগোপাল একদা কতিপয় সওদাগরকে

* 'মানসী ও মর্ম্মবাণী'—১৩৩২ বৈশাখ সংখ্যা হইতে উদ্ধৃত।

বাণিজ্যব্যপদেশে বরদোয়ায় যাইতে দেখিয়া তাঁহাদিগের সহগামী হন। ঘটনাক্রমে মহাপুরুষ শঙ্করদেবের সহিত সেখানে তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। আউনিআটীর দত্তদেব-বিরচিত গোপালদেব-চরিত পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, 'দেবগোপাল' শঙ্করদেবকে আত্মপরিচয় প্রদান করিলে পর শঙ্করদেব তাঁহাকে বলিলেন, "গোপাল, তোমার পিতামহ হরিবর আচার্য্য আর আমি এক স্থানের লোক। ম্লেচ্ছজাতির উপদ্রবে দেশত্যাগ করিয়া বিভিন্ন স্থানবাসী হইয়াছি।"

পূর্ব্বে আমরা উল্লেখ করিয়াছি যে, হরিবর আচার্য্য সদিয়া অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন। কোথায় সদিয়া, আর কোথায় শঙ্করদেবের বাসস্থান বরদোয়া অঞ্চল? উভয়ে একস্থানের লোক ছিলেন কি না অদ্যাবধি আমরা তাহার কোন প্রমাণ পাই নাই।

যাহাহউক, শঙ্করদেবের উপদেশ শুনিয়া দেব গোপালের চিত্তে ভগবদ্ভক্তির উদ্রেক হয়। তিনি তাঁহার নিকট অবস্থান করিবার জন্য মনস্থ করিলেন। কিন্তু সওদাগরেরা তাঁহাকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে অস্বীকৃত হওয়ায়, দেবগোপাল বাধ্য হইয়া উহাদিগের সহিত স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন। শঙ্করদেবের উপদেশ শুনিয়া তাঁহার চিত্তে ভাবান্তর হইল। ক্রমে তিনি সংসারবিরাগী হইয়া বৈষ্ণবদিগের সংসর্গে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

ইহার কিছুকাল পরে শঙ্করদেব যখন মরাণ জাতির উপদ্রবে অতিষ্ঠ হইয়া বরদোয়া পরিত্যাগপূর্ব্বক পাটবাউসীতে আসিয়া অবস্থান করিয়াছিলেন, তৎকালে দেবগোপাল পুনরায় সওদাগরদিগের নৌকায় উঠিয়া কামরূপে মাধবদেবের নিকট আসিয়া কয়েক দিন তাঁহার গৃহে থাকেন। দামোদরদেব তখন শঙ্করদেবের ধর্ম্মমত প্রচার করিতেছিলেন। মাধবদেবের গৃহে অবস্থানকালে পরম কৃপালু শঙ্করদেবের অনুমতিক্রমে দেবগোপাল, দামোদর দেবের নিকট দীক্ষাগ্রহণ করেন। অনন্তর মাধবদেব দেবগোপালকে উজনীয়া অঞ্চলে মহাপুরুষীয়াধর্ম্ম প্রচারার্থ পাঠাইয়া দেন। তিনি উজনীয়া অঞ্চলের নানাস্থানে ধর্ম্মপ্রচার করিয়া পুনরায় মাধবদেবের নিকট আগমন করেন এবং তথা হইতে জগন্নাথক্ষেত্রে যাত্রা করেন। সেখান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পুনরায় মাধবদেবের সহিত অবস্থান করেন। মাধবদেব পুনরায় তাঁহাকে উজনীয়া অঞ্চলে ধর্ম্মপ্রচারার্থ পাঠাইয়া দেন।

দেবগোপাল সেখানে গিয়া কাঁহিকুচি, ডোবেরাপার, পৌরাণি প্রভৃতি সত্র স্থাপন করেন। উজনীয়া হইতে কামরূপে ফিরিয়া আসিয়া তিনি শুনিলেন, মাধবদেব স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। দেবগোপাল এখানে শঙ্করদেবের পৌত্র পুরুষোত্তম ঠাকুরের গৃহে ৮ মাস অবস্থান করিবার পর উজনীয়া অঞ্চলে চলিয়া যান। ইহার পর তিনি 'রামচরণ আতা' ও লক্ষ্মীকান্ত দেবের পুত্র 'হরিদেব' এর সহিত কয়েকজন ভক্ত ও বহু অর্থ দিয়া জগন্নাথক্ষেত্র হইতে "গোবিন্দ" নামক কৃষ্ণমূর্ত্তি আনয়ন করেন এবং শঙ্করদেবের প্রতিষ্ঠিত মদনগোপালমূর্ত্তি কুরুবাহী সত্রে স্থাপন করেন। এই গোবিন্দমূর্ত্তি অদ্যাবধি আউনিআটী সত্রে এবং মদনগোপালমূর্ত্তি কুরুবাহীতে প্রতিষ্ঠিত আছে।

দেবগোপাল চিরকুমার ছিলেন। তিনি বংশী লইয়া সর্ব্বদা কৃষ্ণবিষয়ক গান করিতেন বলিয়া লোকে তাঁহাকে "বংশীগোপাল" বলিয়া ডাকিত। বংশীগোপাল শঙ্করদেবের আজ্ঞায় দামোদর দেবের নিকট কেবল দীক্ষাগ্রহণ করেন নাই, তিনি মাধব দেবের নিকট ৭ বৎসর থাকিয়া শঙ্করদেবের ধর্ম্মনীতি শিক্ষা ব্যতীত তাঁহারই কথামত উজনীয়াতে সত্র স্থাপন করেন। গোপালদেবের চরিত-পুঁথিতে আছে যে, মাধবদেবের আজ্ঞানুসারে তিনি উজনীয়া অঞ্চলে শঙ্করদেবের ধর্ম্মমত প্রচার করিয়াছিলেন:—

মহাপুরুষর ধর্ম্ম সপিয়া লোকত।
দেহ এরি রহিলন্ত বৈকুণ্ঠপুরত॥
—গোপালদেব-চরিত।

বংশীগোপাল ১৫৭২ শকের মাঘ মাসে কৃষ্ণ তৃতীয়ার দিন কুরুবাহী সত্রে দেহত্যাগ করেন। তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যে মিশ্রদেব, নিরঞ্জন দেব জয়হরি দেব, লক্ষ্মীকান্তদেব, অর্জ্জুন দেব, গতি কান্ত, হরি ও দামোদর এই কয়জন ব্যক্তি সবিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন। বংশীগোপাল দেবের দেহত্যাগের পর মিশ্রদেব কুরুবাহী সত্রের ধর্ম্মগদি অধিকার করেন। ইঁহার দুই পুত্র—রামচন্দ্র ও

কৃষ্ণচন্দ্র। রাজ-আজ্ঞায় মিশ্রদেবের প্রাণদণ্ডের পর রামচন্দ্র কুরুবাহী সত্রের অধিকারী হন এবং কৃষ্ণচন্দ্র ডিফলু সত্র স্থাপন করেন। উক্ত নিরঞ্জন ১৫৭৮ শকে আহোমরাজ জয়ধ্বজ সিংহকে (৫) শরণ দেন। রাজা তাঁহাকে প্রভূত ভূসম্পত্তি প্রদান-পূর্ব্বক আউনীআটী সত্র (৬) স্থাপন করাইয়া দেন। নিরঞ্জন দেবের সহিত বনদেবের খুব বন্ধুত্ব ছিল। তিনি রাজাকে বলিয়া কোচবিহার হইতে বনমালী দেবকে আনাইয়া দক্ষিণপাট সত্র স্থাপন করাইয়া দেন।

বংশীগোপাল দেবের নামানুযায়ী কোন স্বতন্ত্র বৈষ্ণব সম্প্রদায় নাই; তবে গোপাল দেবের বা গোপাল আতার একটী সম্প্রদায় আছে। নিম্নে বংশীগোপাল দেবের প্রধান প্রধান শিষ্যগণ প্রতিষ্ঠিত সত্রগুলির নামোল্লেথ করা হইল :—

মিশ্র দেব	...	কুরুবাহী সত্র।
নিরঞ্জন দেব	...	আউনিআটী।
জয়হরি দেব	...	গরমুর। *
অর্জ্জুন দেব	...	নচাপরি।
গতিকান্ত	...	শ্রবণীয়া।
হরি	...	পরপুখুরীয়া।
দামোদর	...	জথলাবন্ধ।

দামোদরীয়া ও মহাপুরুষীয়াসত্র—বংশীগোপাল দেবের শিষ্যগণদ্বারা প্রতিষ্ঠিত সত্রগুলি বর্ত্তমান-কালে দামোদরীয়া বলিয়া পরিচয় দেয়। কিন্তু আদিতে সেগুলি "মহাপুরুষীয়াসত্র" নামে খ্যাত ছিল। কেন না বংশীগোপাল দেব মাধব দেবের দ্বারা মহাপুরুষ শঙ্কর দেবের ধর্ম্মমত প্রচারার্থ প্রেরিত হইয়াছিলেন। পূর্ব্বে আসামের বৈষ্ণব-ধর্ম্মকে "মহাপুরুষের ধর্ম্ম" বলা হইত। অধুনা নানা কারণে মূল সত্রগুলির নানা শাখা হওয়ায় প্রত্যেক শাখার প্রধান আচার্য্যের নামে সত্রগুলি পরিচয় দিতেছে। মূল সত্রগুলির শাখাপ্রশাখা বহুসংখ্যক স্থানে বিস্তৃত হইয়া বহুসংখ্যক সত্র হইয়া গিয়াছে।

মহাপুরুষীয়া ধর্ম্মাবলম্বী সত্রগুলির প্রত্যেক-টীতে অল্প অল্প নিয়ম প্রণালীর বিভিন্নতা লক্ষিত হয়। গোঁসাইগণের স্বেচ্ছাভাবই ইহার কারণ; কিন্তু এই সম্প্রদায়ের কোন গোস্বামী আদিতে মহাপুরুষ শঙ্করদেব ও মাধবদেবের নির্দ্দিষ্ট বিধানের কিছুমাত্র অন্যথা করেন নাই। সকলেই এক মতানুবর্ত্তী ছিলেন। মহাপুরুষীয়াদিগের মতে "শঙ্করদেব ও মাধবদেবকে গুরু ঠিক রাখিয়া তাঁহাদের সহিত "আতা" প্রভৃতি উপাধিধারী ব্যক্তিকে গুরুশ্রেণীতে ভুক্ত করা যায়।" গোপাল দেবী সম্প্রদায়ে শঙ্করদেব ও মাধবদেব গুরুরূপে বৃত আছেন। তবে মহাপুরুষীয়েরা যে সকল "আতা"কে গুরু বলিয়া তাঁহাদের নাম স্মরণ করেন, গোপাল দেবীরা তাহা না করিয়া অন্যান্য "আতা"কে গুরু বলিয়া তাঁহাদের নাম স্মরণ করেন; কিন্তু উভয় সম্প্রদায়ের মূলে শঙ্করদেব ও মাধবদেব আদি গুরুরূপে বৃত আছেন।

আমরা পূর্ব্বে আউনীআটী ও গরমূর সত্রের কথা বলিয়াছি। এই সত্রদ্বয় ব্রহ্মসংহতির অন্ত-র্গত। মানবজীবনে যেমন বাল্য যৌবন ও বার্দ্ধাক্য অবস্থা আছে, তেমনি মহাপুরুষীয়া ধর্ম্মের 'ব্রহ্ম-সংহতি' প্রথম অবস্থা, 'পুরুষসংহতি' মধ্যমাবস্থা এবং 'কালসংহতি' শেষ অবস্থা। শ্রীশঙ্করদেব শ্রীদামোদর দেবকে ব্রহ্মসংহতি প্রদান করিয়া ছিলেন :—

"মলয়া বিজ্ঞান ভক্তি সংহতি ব্রহ্মার।
এই তিনি দিলো লৈয়ো দামোদর ॥"

উপসংহারে বক্তব্য—শঙ্করদেবের হৃদয়ের উদারতা অপূর্ব্ব ছিল। তিনি দামোদর দেবের প্রতি এরূপ অনুগ্রহপরায়ণ ছিলেন যে, তাঁহার প্রাধান্য বৃদ্ধির জন্য তিনি বংশীগোপালকে দামোদর দেবের নিকট পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। শঙ্করদেব নিজে কোন বৈষ্ণব সম্প্রদায় গঠন করেন নাই। তাঁহার দেহত্যাগের পর ধর্ম্মগদির অধিকার লইয়া বিরোধ হইলে তদীয় পুত্র রামানন্দের মধ্যস্থতায় মাধবদেব তাঁহার উত্তরাধিকারী হন। তখন বামুনীয়া শিষ্যেরা বিরক্ত হইয়া মহাপুরুষ শঙ্করদেবকে খারিজ করিয়া নদীয়ার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে তাঁহাদিগের গুরু বলিয়া ঘোষণা করেন। এ সম্বন্ধে সৎসম্প্রদায় নামে একখানি জাল পুঁথিও কয়েক বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল। শ্রীচৈতন্য দেবের কামরূপ আগমন কিন্তু সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন—অলীক।

---

(৫) জয়ধ্বজ সিংহ—ইনি আউনিআটী, দক্ষিণপাট, কুরুবাহী, ও গরমূর এই সত্রচতুষ্টয়ের গোস্বামীগণের প্রভূত ভূসম্পত্তি ও অন্যান্য গোস্বামীগণের অপেক্ষা তাঁহাদিগকে অধিক সম্মান প্রদান করিয়াছিলেন।

(৬) এই সত্রের বিষয় ফাল্গুন-সংখ্যার সম্মিলনীতে প্রকাশিত হইয়াছে।

* গরমুর—এই সত্রের বর্ত্তমান অধিকারীর নাম শ্রীযুত পিতাম্বর দেব গোস্বামী।

আকারমাত্রিক স্বরলিপি-পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা।

১। স র গ ম প ধ ন=সপ্তক। খাদ সপ্তকের চিহ্ন—স্বরের নীচে হসন্ত, এবং উচ্চ সপ্তকের চিহ্ন—স্বরের মাথায় রেফ্।

২। কোমল র=ঋ; কোমল গ=জ্ঞ; কড়ি ম=হ্ম; কোমল ধ=দ; কোমল ন=ণ।

৩। তাল বিভাগের চিহ্ন, পার্শ্বে এক-একটী দাঁড়ি। ১, ২´, ৩, ০ ইত্যাদি তালি ও ফাঁকের অঙ্ক। যে অঙ্কের মাথায় রেফ্ তাহাই সম্।

৪। তালের একফেরা হইয়া গেলে দাঁড়ির স্থলে "আই" এই ইংরাজী অক্ষরটী বসে; আরম্ভ ও শেষে দুই "আই" বসে।

৫। একমাত্রা=।। অর্দ্ধমাত্রা=ঃ। দুইটী অর্দ্ধমাত্রা, যথা 'সরা'। চারিটী সিকিমাত্রা, যথা "সরগমা"। দুইটী সিকিমাত্রা, যথা সরঃ। একটী অর্দ্ধমাত্রা ও দুইটী সিকিমাত্রা মিলিয়া একমাত্রা, যথা সঃ গরঃ। একটী দেড়মাত্রা ও একটী অর্দ্ধমাত্রা মিলিয়া দুই মাত্রা, যথা রাঃ গঃ।

৬। কোন আসল স্বরের পূর্ব্বে যদি কোন নিমেষকালস্থায়ী আনুষঙ্গিক স্বর একটু ছুঁইয়া যায় মাত্র, তাহা হইলে সেই স্বরটী ক্ষুদ্র অক্ষরে আসল স্বরের বাম পার্শ্বে লিখিত হয়, সরা—গরা। গমকের স্থলে প্রায়ই এইরূপ স্পর্শমাত্রিক স্বর লাগিয়া থাকে। আসল স্বরের পরে কখন কখন অন্য স্বরের ঈষৎ রেশ লাগে; তখন ঐ স্বর ক্ষুদ্র অক্ষরে দক্ষিণপার্শ্বে লিখিত হয়, যথা রাস।

৭। বিরামের চিহ্ন ও মাত্রাসমূহের চিহ্ন একই; হাইফেন্-বর্জ্জিত হইলে, এবং স্বরাক্ষরের গায়ে সংলগ্ন না থাকিলেই সেই মাত্রা বিরামের মাত্রা বলিয়া জানিবে। স্বরের ক্ষণিক নিস্তব্ধতাকে বিরাম বলে।

৮। অবসানের চিহ্ন, শিরোদেশে যুগল দাঁড়ি। হয় এইখানে একেবারে থামিবে; নয় এইখানে থামিয়া গানের অন্য কলি ধরিবে।

৯। পুনরাবৃত্তি অর্থাৎ আস্থায়ীতে প্রত্যাবর্ত্তনের চিহ্নস্বরূপ দুইটি করিয়া "আই" বসে। কোন কলির শেষে II এই যুগল "আই" দেখিলেই আস্থায়ীর যেখানে এইরূপ যুগল "আই" আছে সেইখান হইতে আবার আরম্ভ করিবে।

১০। পৌনরুক্তির চিহ্ন, এই { } গুম্ফ বন্ধনী; এবং পৌনরুক্তিকালে কতকগুলি স্বর বাদ দিয়া যাইবার চিহ্ন, এই ( ) বক্র বন্ধনী, যথা { সা রা গা (মা পা) ধা না }

১১। পুনরাবৃত্তি ও পৌনরুক্তিকালে কোন স্বরের পরিবর্ত্তন হইলে, শিরোদেশে ব্র্যাকেটের মধ্যে পরিবর্ত্তিত স্বরগুলি স্থাপিত হয়। যথা,—
[রা গা মা]
সা রা গা।

ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি।

(জগপতি)

ভৈরব—চৌতাল।

তুমি হে জগপতি দেব বুদ্ধিদাতা
আছ করি' সব পূর্ণ।
যে-ই যে-ই চাহে
সে-ই সেই তোমা পায় হে।
ভক্তিকুসুম লহ প্রেমচন্দ্র!
সর্ব্বেশ্বর! নাম তব গাহে
কত শত সুরনর তিন লোকে।
মম চিত্তে গীত নবছন্দ
জাগি' উঠে তব অঙ্কিত
অপরূপ হেরি' চারিদিশি শোভা
হে সর্ব্ববন্দিত!

কথা—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সুর—তানসেন

স্বরলিপি—সঙ্গীতাচার্য্য ৺রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী

৩ ৪ ॥ ১´ ০ ২ ০ ৩
মগা ॥ -মগা মা । -পা -া I ণা -দা । -পা দা । পা -মা । পা মগা । ঋা ঋা ।
তু॰ ॥ ॰ মি । ॰ ॰ I হে ॰ । ॰ জ । গ ॰ । প তি॰ । ॰ দে ।

৪ ১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
। -মগা -পমা I গা -া । -ঋা গা । -ঋা -া । সা -ণ্ (া) । -সা ণ্দা । -া -া I
। ॰ ॰ব I বু ॰ । ॰ ন্ধি । ॰ ॰ । দা ॰ । ॰ ত্তা॰ । ॰ ॰ I

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
I সা -া । সা সা । মগা -মগা । মা পা । -মা -পা । মা -গমা I
I আ ॰ । ছ ক । রি॰ ॰ । স ব । ॰ ॰ । পূ ॰ I

১´ ০ ২ ০
I ণা -দপা । -দা -পা । -মা -পা । -মগা মগা ॥
I র্ণ ॰ । ॰ ॰ । ॰ ॰ । ॰ "তু"॰ ॥

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪ ১´
॥ পা -া । মা ণা । -দা র্সা । র্সা -র্না । র্সা -নর্সা । -না -র্সা I র্সা র্সা ।
॥ যে ॰ । ই যে । ॰ ই । চা ॰ । হে ॰ । ॰ ॰ I সে ই ।

০ ২ ০ ৩ ৪ ১´ ০
। -া র্গা । -র্ঋা র্সা । র্সা র্সা । -া র্সণা । -দা পা I দা পা । -া মগা ।
। ॰ দে । ॰ ই । তো মা । ॰ পায়্ । ॰ হে I ভ ক্তি । ॰ কু॰ ।

২ ০ ৩ ৪ ১´ ০ ২
। -মগা মা । মা ণা । -দা ণা । -দা -র্সা I র্সা ণদা । -া ণা । -দা -পা ।
। ॰ সু । ম ল । ॰ হু । ॰ ॰ I প্রে ম॰ । ॰ চা । ॰ ন্ত্র ।

০
। দা -মা ॥
। "তু" ॰ ॥

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪ ১´
॥ মা -গা । মা -পা । পা পা । দা -া । দা ণা । দা -পা I পা মা ।
॥ স ॰ । র্বে ॰ । শ্ব র । না ॰ । ম ত । ব ॰ I গা হে ।

০ ২ ০ ৩ ৪ ১´ ০
। ণা দা । ণা র্সা । র্সনা -র্ঋা । র্সা -ণদা । দা পা I পা মগা । -মা ণা ।
। ক ত । শ ত । সু॰ ॰ । র ॰ । ন র I তি ন॰ । ॰ লো ।

২ ০ ৩ ৪ ১´ ০ ২
। -দা পা । পা মগা । -মা ঋা । -া সা I সা -া । সা মগা । -মা গা ।
। ॰ কে । ম ম॰ । ॰ চি । ॰ত্তে I গী ॰ । ত ন॰ । ॰ ব ।

০ ৩ ৪ ১´ ০ ২ ০
। দা -া । -া -ণা । দা -পা I পা -া । পা ণা । -দা ণা । র্সা র্সা ।
। ছ ॰ । ॰ ॰ । ন্দ ॰ I জা ॰ । গি উ । ॰ ঠে । ভ ব ।

৩ ৪ ১´ ০ ২ ০ ৩
। র্সনা -র্সা । র্সা র্সা I র্সা র্সা । -া র্গা । -র্ঋা র্সা । র্সা না । -র্ঋা র্সা ।
। ন্ধং॰ ॰ । কি ত I অ প । ॰ রূ । ॰ প । হে রি । ॰ চা ।

```
 ৪       ১´        ০        ২           ০         ৩        ৪
| ণা -দা I দা পা | -া পা | মগা -মা | মা -ণা | -দা ণা | -র্সা র্সা I
| রি  ০  I দি শি | ০ শো | ভা০  ০ | হে  ০ | ০  স | ০  র্ব I

 ১´        ০        ২        ০
I র্সা -ণা | -দা ণা | দা -পা | মা -া ॥ ॥
I ব   ০ | ০ ন্দি | ত  ০ | "তু" ০ ॥ ॥
```

—০—

ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি।

(নববর্ষ)

আশা-ভৈরবী—গীতাঙ্গী।

নবীন বর্ষে নবীন হর্ষে
বিহগ গাহে নূতন গান;
আমি কি হেথায়, তুচ্ছ ব্যথা লয়ে
রহিব ক্ষুব্ধ বিষাদম্লান ?

শ্যাম-বনরাজি সেজেছে সুন্দর
কি নীল অঞ্জনে মেচুর অম্বর
একি ফুলহাসি একি কলবাঁশী
আমি হেথা আসি র'ব কি ম্রিয়মাণ ?

আমারে তুমি নবীন করি লহ
জীবন-ব্যথাভার হয়েছে দুঃসহ
আলোক দাও মোরে জীবন দাও হে
এ মোহ-রজনী কর্হ অবসান !

রাখ মোরে প্রভু তোমারি চরণে
অভয় হয়ে যাই জীবনে মরণে
না গণি সুখ-দুখ নেহারি প্রেমমুখ
তোমাতে ভরি' বুক তোমারি গাহি গান॥

কথা, সুর ও স্বরলিপি—শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি-এল্।

```
 ১´          ২        ৩          ১´          ২       ৩ ॥
II ঋা মা -মা | মা -া | জ্ঞমা -পা I পা দা -মা | পা -া | পা -া I
   ন  বী  ন্  বর্ ০   ষে০  ০    ন  বী  ন্   হর্ ০   ষে  ০

 ১           ২          ৩         ১´          ২       ৩
I জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা | মপা -দণা | দা -পা I মা জ্ঞা -া | ঋা -া | সা -া I
  বি  হ  গ     গা০  ০০    হে০  ০   নূ  ত  ০   ন  ০   গান্ ০

 ১´          ২          ৩         ১´          ২       ৩
I র্সা র্সা র্সা | ণর্সা -র্ঋা | ণর্সা -া I ণর্সা -া ণা | দা দা | পা পা I
  আ  মি  কি    হে০  ০      থা  য়্   তু  ০  চ্ছ   ব্য থা   ল  য়ে

 ১´          ২          ৩         ১´          ২       ৩
I জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা | মপা -দণা | দা -পা I মা জ্ঞা -া | ঋা -া | সা -া II
  র  হি  ব     ক্ষু০ ০ব্   ধ  ০   বি  ষা  ০   দ  ০   ম্লা ন্

 ১´          ২          ৩         ১´          ২       ৩
II পা পা মা | পদা -া | ণা র্সা I র্সা র্ঋা ণা | র্সা -া | র্সা র্সা I
   শ্যা ম ব    ন  ০    রা জি   সে  জে  ছে   সু  ন্   দ  র
```

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I ᴿজ্জাঁ জ্জাঁ জ্জাঁ। র্জ্জাঁ -া। জ্জাঁ র্মা I ᴹজ্জাঁ জ্জাঁ জ্ঝাঁ। জ্জর্ঝা -া। র্সা র্সা I
কি নী ল অ ন্ জ নে মে ছ র অ ম্ ০ ব র

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I দা দা দা। র্ঋা -া। র্সা র্সা I ণা ণা ণা। ণদা -া। পা পা I
এ কি সু ল ০ হা সি এ কি ক ল ০ বাঁ শী

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা। মপা -দণা। দা পা I মা জ্ঞা জ্ঞা। জ্ঞঋা ঋা। সা -া II
আ মি হে থা০ ০য়্ আ সি র ব কি স্নি ০ য় মা ন্

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
II সা ঋা ণ্া। সা -াজ্ঞ। জ্ঞা -া I জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা। জ্ঞা জ্ঞা। জ্ঞা জ্ঞা I
আ মা রে তু ০ মি ০ ন বী ন ক রি ল হ

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I জ্ঞা মা মাজ্ঞ। মা মজ্ঞা। মা -া I জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞাম। জ্ঞঋা -া। সা সা I
জী ব ন ব্য থা ভা র্ হ য়ে ছে দুঃ ০ স হ

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I সঋা মা মা। মা -া। জ্ঞা মা I পা দা মা। পা -া। পা -া I
আ লো ক দা ও মো রে জী ব ন দা ও হে ০

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা। মা ণা। দা -পা I মা জ্ঞা জ্ঞাম। জ্ঞা ঋা। সা -া II
এ মো হ র জ নী ০ ক র হ অ ব সা ন্

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
II পা পা মা। ণদা -া। ণা র্সা I র্সা র্ঋা ণা। র্সা -া। র্সা র্সা I
রা খ মো রে০ ০ প্র ভু তো মা রি চ ০ র ণে

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I ᴿজ্জাঁ জ্জাঁ জ্জাঁ। জ্জাঁ জ্জাঁ। র্মা -া I জ্জাঁ জ্জাঁ জ্জাঁম। জ্ঝাঁ -া। র্সা র্সা I
অ ভ য় হ য়ে যা ই জী ব নে ম ০ র ণে

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I দা র্ঋা র্সা। র্ঋা র্সা। ঋর্সা -া I ণা ণা ণদা। ণা দা। পা -া I
না গ ি সু খ দুখ্ ০ নে হা রি০ প্রে ম মু খ্

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা। মা ণা। ণদা -পা I মা জ্ঞা জ্ঞাম। জ্ঞা ঋা। সা -া II II
তো মা তে ভ রি বু ক্ তো মা রি গা হি গা ন্

—•—

জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি।

(সমালোচনা)

(৺যোগীন্দ্রনাথ বসু)

'জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি' শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের উপদেশ—বাবু ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক লিখিত। আদিব্রাহ্মসমাজ-যন্ত্রে মুদ্রিত।

ইংলণ্ডের একজন চিরবিখ্যাত জ্ঞানী কবি বলিয়া গিয়াছেন—"The end of learning is to know God". জ্ঞানোপার্জ্জনের উদ্দেশ্য ঈশ্বরকে অবগত হওয়া। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্ম্ম সম্বন্ধে বড় শিথিলতা আসিয়া পড়িয়াছে, এবং জগৎস্রষ্টার অস্তিত্ব সম্বন্ধে নানাপ্রকার মারাত্মক মত তাহাদিগের কর্তৃক পরিপোষিত হওয়াতে আমাদিগের জাতীয় উৎকর্ষ সাধনের ভিত্তি ক্রমশঃ ক্ষীণ করিয়া দিতেছে। এই শোচনীয় বিষয় লক্ষ্য করিয়া অন্যদেশীয় একজন কৃতবিদ্য প্রাচীন শিক্ষক একদা সভাস্থলে বক্তৃতার সময় বলিয়াছিলেন—"Knowledge without virtue is like a beauty without shame. A learned but vicious man proves as great a nuisance of the society as a handsome woman without chastity." অর্থাৎ ধর্ম্মবিবর্জ্জিত জ্ঞান লজ্জাবিবর্জ্জিত সৌন্দর্য্যের তুল্য। একজন ধর্ম্মহীন জ্ঞানী ব্যক্তি, চরিত্রবিহীন সুন্দরী স্ত্রীলোকের ন্যায় সমাজের অপকার করিয়া থাকে। তাঁহার বাক্য যে আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় যুক্তিযুক্ত তাহা বলা বাহুল্যমাত্র। জ্ঞানোপার্জ্জনের উদ্দেশ্য বিষয়ে এক্ষণে প্রায় সকলেই অন্ধ। জ্ঞান ও ধর্ম্মের সামঞ্জস্য করিয়া নৈতিক জীবন গঠন বিষয়ে এক্ষণে অনেকেই মনোযোগ দেন না। এইরূপ সময়ে পূজ্যপাদ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রদত্ত এই সারবান ও বহুমূল্য উপদেশ সকল পুস্তকাকারে প্রকাশিত হওয়াতে আমরা যারপর নাই আশান্বিত হইয়াছি। তিনি অতি সরলভাবে ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানের সামঞ্জস্য করিয়া যে সকল উপদেশ দিয়াছেন তাহা দ্বারা আমাদের বর্ত্তমান সময়ে মহা উপকার সাধিত হইবে, এইরূপ আশা করা যায়। ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানের সামঞ্জস্য করিতে গিয়া পাশ্চাত্য বিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত বহু গবেষণাপূর্ণ যে সকল বৃহৎ বৃহৎ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, তদ্দ্বারা তাঁহারা আলোচ্য বিষয়টীকে অতি জটিল করিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহারা ঈশ্বরের সৃষ্টিকৌশল দেখাইয়া ঈশ্বরের অস্তিত্বের ভিত্তি দৃঢ় করিতে যেমন প্রয়াস পাইয়াছেন, আমাদের পূজ্যপাদ মহর্ষি উপদেশচ্ছলে অতি সরলভাবে সেই সকল বিষয় চুম্বকাকারে আলোচনা করিয়াছেন, এবং তদ্দ্বারা ঈশ্বরের অনন্ত করুণা ও অনন্ত জ্ঞান প্রতিপাদন করিয়া অনেক সংশয়বাদীদিগের ভ্রম অপনোদন করিয়াছেন।

"মানুষের স্বাধীন ইচ্ছার" বিষয় লিখিতে গিয়া ইংলণ্ডের একজন বিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত সক্রেটিস্ হইতে অদ্যাবধি নানা পণ্ডিতের মত এক বৃহৎ ইতিহাসাকারে সংগ্রহ করিয়া তৎপরে সেই সকল বিষয় মীমাংসা করিয়াছেন; তদ্দ্বারা বিষয়টী এরূপ দুরূহ হইয়াছে যে তাহা পাঠে সন্দেহ দূর হওয়া দূরে থাকুক আরও নানা সন্দেহ মনে উদিত হয়। কিন্তু মহর্ষি ধর্ম্মজগতের এই একটী অত্যাবশ্যকীয় ও গূঢ় প্রশ্ন অতি সুন্দরভাবে সংক্ষেপে বেশ মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন। তিনি এই সকল বিষয় এরূপ গভীর বিশ্বাসের সহিত বলিয়াছেন যে, তাঁহার প্রতি বাক্য সন্দেহ দূর করিয়া দিয়া জলন্ত বিশ্বাস ও ঈশ্বরপ্রীতি মনেতে জন্মাইয়া দেয়। ইহাই এই পুস্তকের মৌলিকত্ব।

আদিম আর্য্যজাতিগণ ভারতবর্ষ কি প্রকারে অধিকার করিল, কি প্রকারে তাহারা এই দেশে বিস্তৃত হইয়া পড়িল, কি প্রকারে তাহাদের মধ্যে জ্ঞানজ্যোতি ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইয়া তাহাদিগকে উন্নত হইতে উন্নততর করিয়াছিল এবং পরম পিতার শুভ ইচ্ছা তাহাদের মধ্যে স্পষ্টরূপে কার্য্য করিয়া কি প্রকারে তাহাদিগকে ধর্ম্মজগতে শ্রেষ্ঠ আসন প্রদান করিয়াছিল এই সকল সত্য মহর্ষি অতি বিশদ ও সুব্যক্তরূপে দেখাইয়াছেন। সেই পুরাকাল হইতে আজ পর্য্যন্ত ঈশ্বরকরুণা অজস্র স্রোতে প্রবাহিত হইয়া আর্য্যজাতিকে অজ্ঞানতার অন্ধকারময় অবস্থা হইতে ধর্ম্মের সম্পূর্ণ অভাব হইতে ক্রমশঃ উত্তোলন করিয়া ধর্ম্ম, জ্ঞান ও সভ্যতার দ্বারা ভূষিত করিয়া পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ জাতি করিল—তাহাও উপদেশ পাঠে যত হৃদয়ঙ্গম হয়, ততই সংশয় ও অবিশ্বাসপূর্ণ হৃদয়ের কাঠিন্য দূর হইয়া মনে গভীর বিশ্বাস ও ঈশ্বরপ্রীতির ভাব উত্থিত হয়।

তাঁহার আদিম আর্য্যজাতিবিষয়ক উপদেশ সকল পাঠ করিয়া আমরা আর একটী বিষয় জানিতে পারি—বেদের উপর নির্ভর করিয়া আদিম আর্য্যজাতির ইতিহাস প্রণয়ন করিতে পারা যায়। তাঁহাদের সামাজিক, নৈতিক, মানসিক ও রাজ্যশাসন ইত্যাদি সকল বিষয়ের বিবরণ যে বেদপাঠে বেশ জানা যাইতে পারে তাহা মহর্ষি উক্তরূপে দেখাইয়াছেন। আদিম আর্য্যজাতির ইতিহাসের উপকরণ বেদে প্রভূত পরিমাণে আছে।

জ্ঞানের উন্নতির সহিত ধর্ম্মের উন্নতি হইবে, ইহাই ঈশ্বরের অভিপ্রেত। ধর্ম্মের ক্রমবিকাশ দ্বারা মনুষ্য তাঁহার দিকে ধাবিত হইবে, ইহাই মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য এবং সেই উদ্দেশ্য সাধনোপযোগী মহর্ষির এই অমূল্য উপদেশ

সকল। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, এই পুস্তক একখানি অমূল্য গ্রন্থ। তাঁহার ব্যাখ্যানের পর, অনেকদিন আমরা এইরূপ গ্রন্থ দেখি নাই। আমরা বঙ্গদেশীয় আবালবৃদ্ধবনিতা সকলকেই এই পুস্তক একবার পাঠ করিতে অনুরোধ করি। নিরপেক্ষভাবে লিখিত এই পুস্তক যে সকলের চিত্তাকর্ষণ করিবে, তাহা আমাদের ধ্রুব বিশ্বাস।

"জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি" আমাদের কেন প্রিয় হইবে, তাহার দুই কারণ আছে। প্রথমতঃ ইহার জ্ঞানগর্ভ ও ধর্ম্মবিষয়ক উপদেশ সকল। দ্বিতীয়তঃ ইহা আমাদের পূজ্যপাদ মহর্ষিদেবের ধর্ম্মজীবনের শেষবাক্য। প্রাতঃস্মরণীয় আর্য্য ঋষিদের অমূল্য বাক্যসকল যেমন আমাদের হৃদয়ের ধন, আশা করি, মহর্ষিদেবের এই অমূল্য উপদেশ সকল সেইরূপ হইবে।

বহুকাল পূর্ব্বে তিনি 'ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান' প্রকাশ করিয়া বিপথগামী বহু লোককে ধর্ম্মপথে আরোহন করাইয়া দিয়াছিলেন এবং এক্ষণে সেই পথগামী অপর লোকদিগের অজ্ঞনয়ন জ্যোতিষ্মান করিবার জন্য তাঁহার "জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি" প্রকাশিত করিলেন। প্রথমটী আমাদের ধর্ম্মপথে যষ্টিস্বরূপ ও দ্বিতীয়টী আলোকস্বরূপ হইবে। তাঁহার নিকট আমরা কতদূর ঋণী তাহা বাক্যে প্রকাশ করিতে পারা যায় না। ক্ষিতীন্দ্রবাবু বহু পরিশ্রমে এই উপদেশসমূহ সংগ্রহ করিয়া বঙ্গদেশের কৃতজ্ঞতার পাত্র হইয়াছেন।

২রা পৌষ, ১৩০০—সঞ্জীবনী।

ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রকৃতি—অধ্যাত্মবিষয়ক বহুগ্রন্থ প্রণেতা, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্র নাথ ঠাকুর, তত্ত্বনিধি বি-এ বিরচিত—হিতৈষণা-গ্রন্থাবলীর অন্তর্ভুক্ত। কলিকাতা ৫৫নং আপার চিৎপুররোডস্থ আদিব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রকাশিত, মূল্য এক টাকা মাত্র।

গ্রন্থকার নিবেদনে বলিয়াছেন—"সাধারণ লোক যাহাতে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রকৃতি জানিতে ইচ্ছা করেন এবং বুঝিতে পারেন, সেই প্রকার যথাযুক্ত সহজভাবে এবং সহজ ভাষায় গ্রন্থখানি লিখিবার চেষ্টা করিয়াছি। কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, তাহা পাঠকগণই বিচার করিবেন।" আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে, গ্রন্থকার এ বিষয়ে সম্পূর্ণ সফলকাম। বেদ ও উপনিষদের সার সত্যসম্বলিত একেশ্বরবাদী ব্রাহ্মধর্ম্মের নামে যাঁহাদের প্রাণে আতঙ্ক উপস্থিত হয় এই পুস্তকখানি তাঁহাদের আদ্যোপান্ত পাঠ করা উচিত। ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে শ্রীভগবানের শ্রীমুখনিঃসৃত আত্মার আশ্বাসবাণী হইতে সমুদ্ভূত সার সত্যমূলক বৈদিক ধর্ম্মের আবর্জ্জনা নিরাকৃত করিয়া কিরূপে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহার ইতিহাস এই পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে ধর্ম্মের সংজ্ঞা, মূল প্রকরণ, উদ্দেশ্য হইতে আরম্ভ হইয়া ব্রহ্মজ্ঞানমূলক সমস্ত বিষয় সহজ সরল ভাষায় বিবৃত হইয়াছে। ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ধর্ম্মের পার্থক্য, সকল ধর্ম্মের পরিণতি প্রভৃতি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত হওয়ায় পুস্তকখানি সুখপাঠ্য হইয়াছে। "আলো ও ছায়া" প্রভৃতি গ্রন্থ-রচয়িত্রী শ্রীমতী কামিনী রায়, বি-এ মহোদয়া কর্ত্তৃক ব্রাহ্মধর্ম্মের ঐতিহাসিক আলোচনাসম্বলিত ভূমিকা গ্রন্থখানিকে আরও উপাদেয় করিয়াছে। আমরা পুস্তকখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

সুবর্ণবণিক সমাচার—বৈশাখ, ১৩০২।

শান্তি—শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্বনিধি বি-এ কর্ত্তৃক বিরচিত। মূল্য বারো আনা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান আদিব্রাহ্মসমাজ কার্য্যালয়, ৫৫ আপার চিৎপুর রোড কলিকাতা।

ভক্ত গ্রন্থকার সংসারের শোক-দুঃখের জ্বালা হইতে আত্মত্রাণের প্রয়াসে সময় সময় যে সকল কবিতা লিখিয়াছেন তাহা একত্র করিয়া গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিয়াছেন; তাই গ্রন্থের নাম দিয়াছেন শান্তি। শান্তির কবিতাগুলি কবিতা-হিসাবে উচ্চ অঙ্গের না হইলেও সে গুলিতে ভক্তহৃদয়ের যে কাতর প্রার্থনা, সাধকের উচ্ছ্বাস, একনিষ্ঠ নির্ভরতা, ওতপ্রোত-ভাবে বিরাজিত রহিয়াছে—তাহাতেই এই গ্রন্থ সার্থকনামা। ইহাতে এমন কবিতা ও গান অনেক আছে যাহা সংসারের সঙ্কট সময়ে পাঠ করিলে—উপলব্ধি করিলে ভগবৎপ্রেম জাগ্রত করিয়া পাঠক-পাঠিকাকে নির্ম্মল শান্তি দান করিতে সমর্থ হইবে।

'নাহি জানি' আমি কত করি দোষ
আমি শিশু অতি কোরোনাকো রোষ
তোমারি চরণে এসেছি পড়িয়া
আর কভু দূরে যাব না চলিয়া
মাগো জননী'—

বিশ্বজননীর নিকট অক্ষম সন্তানের এই চরম কাতর প্রার্থনা। সন্তানই কেবল অনুভব করিতে সমর্থ, মা আমার যে জগতের সর্ব্বস্ব, বিশ্বের আনন্দ, সকল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী বরাভয়প্রদা! তাঁহার নিকটে অহর্নিশি থাকিতে পারিলে আর কিসের ভয়—কিসের দুঃখ!

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

পরিচারিকা—চৈত্র, ১৩০০।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৯ই আষাঢ় মঙ্গলবার ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের ত্রিসপ্ততিতম সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় উক্ত সমাজমন্দিরে ব্রহ্মোপাসনা হইবে। যথাসময়ে সর্ব্বসাধারণের উপাসনায় যোগদান একান্ত প্রার্থনীয়।

নিবেদন।

গ্রাহকগণের প্রতি।

১। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বর্ষ বৈশাখ হইতে আরম্ভ হয়। বৎসরের যে কোন সময় হইতে পত্রিকার গ্রাহক হইলে তাঁহাকে সেই বৎসরের ১ম সংখ্যা হইতে পত্রিকা লইতে হইবে।

২। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সহ ৩৶০ আনা; প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ।০ চারি আনা। ভিঃ পিঃ খরচ স্বতন্ত্র। অসমর্থ, ছাত্র এবং মহিলাদের জন্য বার্ষিক মূল্য ২৶০।

৩। প্রতি মাসের সাধারণত প্রথম সপ্তাহেই পত্রিকা প্রকাশিত হয়। গ্রাহকগণ প্রতি মাসের শেষ তারিখের মধ্যে পত্রিকা না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে তদন্ত করিবেন; না পাইলে ম্যানেজারের নিকট পত্র লিখিবেন। যে মাসের পত্রিকা, সেই মাস অতীত হইলে অপ্রাপ্ত সংখ্যা বিনামূল্যে দেওয়া হইবে না।

৪। বিনামূল্যে নমুনা-স্বরূপ পত্রিকা দেওয়া হয় না। তিন আনা মূল্যের ডাকটিকিট পাঠাইলে নমুনা একখণ্ড পাঠান হয়।

৫। গ্রাহকগণ অনুরোধ করিলে ভি-পিতে পত্রিকা পাঠানো হয়। অতিরিক্ত খরচ ।০ চারি আনা লাগে।

৬। ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে পূর্ব্ব মাসের ২২শে তারিখের মধ্যে জানাইতে হইবে। অল্পদিনের জন্য ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে ডাকঘরের সহিত বন্দোবস্ত করাই সুবিধা।

লেখকগণের প্রতি।

৭। লেখকগণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক প্রবন্ধের নকল রাখিয়া পাঠাইবেন।

৮। উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প দেওয়া থাকিলে রচনা মনোনীত হওয়ার সংবাদ অথবা অমনোনীত হইলে পাণ্ডুলিপি ফের দেওয়া হয়।

বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রতি।

৯। বিজ্ঞাপনের মূল্য মাসে মাসে অগ্রিম দেয়।

১০। বিজ্ঞাপন বন্ধ বা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে পূর্ব্ব মাসের ২০শে তারিখের মধ্যে জানাইতে হইবে। শেষ বিজ্ঞাপন প্রকাশের পর পনেরো দিনের মধ্যে ব্লক ফেরত না লইলে উহা হারাইলে আমরা দায়ী হইব না।

১১। অশ্লীল প্রভৃতি বিজ্ঞাপন ছাপা হয় না। বর্জ্জাইস অক্ষরে বিজ্ঞাপন ছাপি না। ছাপিতে হইলে সাধারণ দর অপেক্ষা অধিক মূল্য লাগিবে। ব্লক ভাঙ্গিয়া গেলে তজ্জন্য আমরা দায়ী নহি।

১২। সমস্ত বিজ্ঞাপনই সাধারণতঃ স্মলপাইকায় ছাপা হয়। হেডিং প্রভৃতিতে মানানসই অক্ষর ব্যবহৃত হয়।

১৩। বিজ্ঞাপনের মাসিক মূল্য:—পূর্ণ পৃষ্ঠা ৮৲; অৰ্দ্ধ পৃষ্ঠা ৪॥০; সিকি পৃষ্ঠা ২॥০; সিকি কলম ১॥০ টাকা।

১৪। বিশেষ সুবিধাজনক স্থানে বা দীর্ঘকাল প্রকাশের জন্য বিজ্ঞাপনের মূল্য পত্র লিখিলে জানান হয়।

১৫। পত্রিকার মূল্যাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নামে এবং বিনিময়ের জন্য পত্রিকাদি সম্পাদকের নামে পাঠাইবেন।

১৬। পত্রিকা সম্বন্ধে যাবতীয় জ্ঞাতব্য নিম্নোক্ত ঠিকানায় পাইবেন।

১৭। পত্রিকার বহুল প্রচারের জন্য এবং বিজ্ঞাপন সংগ্রহের জন্য এজেন্ট আবশ্যক। আমাদের নিযুক্ত এজেন্টগণ সম্বন্ধে বিশেষ সুবিধাজনক স্থায়ী আয়ের ব্যবস্থা করা হয়। সাক্ষাতে তাহার বিবরণ জানিতে পারিবেন।

আদিব্রাহ্মসমাজ
৫৫, আপার চিৎপুর রোড
কলিকাতা।

কার্য্যাধ্যক্ষ—
শ্রীসুরেশচন্দ্র সাংখ্যবেদান্ততীর্থ।

প্রভাতী।

(নূতন পুস্তক প্রকাশিত হইল)

ইহা একখানি পদ্যাত্মক গদ্যে লিখিত সম্পূর্ণ নূতন ধরণের গ্রন্থ।

প্রভাতের আলোকে ও উদ্দীপনায় উদ্ভাসিত এবং নব্যযুগের অপূর্ব্ব জাগরণধ্বনিতে মুখর; অন্তরে ও বাহিরে নূতনত্বের ভঙ্গীতে নিত্য উৎসবময়। রাঁচিপ্রবাসী ৺জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর বলিয়াছেন—"প্রভাতীর উচ্ছ্বাসগুলি বেশ লাগ্‌ছে। প্রভাতের তাজা ফুলের মত রমণীয়।" রয়াল ১৬ পেজী—১২৬+৩৪ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য ৷৹ আনা।

আদর্শ বা দাদাঠাকুর।

(মুকুন্দ দাসের যাত্রায় অভিনীত)

খ্যাতনামা কথক কবিবর শ্রীহেমচন্দ্র কবিরত্ন মহাশয়ের নাট্যপ্রতিভা তাঁহার এই "আদর্শ বা দাদাঠাকুরে" প্রফুটিত শতদলের মত সত্যই বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। ইহাতে বাঙ্গালার পল্লীসমাজের একটী নিত্য পরিচিত 'সমস্যা' লেখকের ভাবে ভাষায় ও অপূর্ব্ব চরিত্রাঙ্কনে জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। ইহার এক-একটী সঙ্গীত অসাধারণ কাব্যসৌন্দর্য্যে যেমন মনোহরণ করে তেমনি নবীন ভাব ও চিন্তার সংস্পর্শে চিত্তকে উদ্‌বুদ্ধ করে। ডিমাই ৮ পেজী আকারের ১১১ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য ১৲ টাকা মাত্র; কিন্তু নব্যবঙ্গের উপকার হইবে বলিয়া বহুল প্রচারার্থ আমরা ইহা অর্দ্ধ মূল্যে বিতরণ করিব স্থির করিলাম।

উপরোক্ত গ্রন্থ প্রভৃতির প্রাপ্তিস্থান:—আদিব্রাহ্মসমাজ ৫৫ আপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।



সত্তার বিচার মূল্যের দ্বারা হয় না, একমাত্র গুণের দ্বারা ইহা স্থির হইতে পারে। সীলেট চূণের মূল্য আপাততঃ অধিক মনে হইলেও বাস্ত[illegible]ক অতি সুলভ এ চুণে যে কাজ করা যায়, তাহা শীঘ্র খারাপ হয় না এবং বহুকাল স্থায়ী হয়, এ সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ নাই। দেড় শত বৎসর ধরিয়া "সীলেট চুণ" সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া সমাদৃত এবং ইহাই ইহার গুণের যথার্থ পরিচায়ক।

সীলেট লাইম কোং লিমিটেড্। ম্যানেজিং এজেণ্ট—

মেসার্স কিলবরণ এণ্ড কোং, ৪ নং ফেয়ারলি প্লেস কলিকাতা।

একমেবাদ্বিতীয়ং

একবিংশ কল্প
তৃতীয় ভাগ
আষাঢ়, ব্রাহ্মসম্বৎ ৯৬।

৯৮৩ সংখ্যা | ১৮৪৭ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

সম্পাদক—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কলিগতাব্দ ৫০২৬। সম্বৎ ১৯৮২। খৃঃ ১৯২৫। শক ১৮৪৭। সাল ১৩৩২।

অঞ্জলি।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

৫৯। অঞ্জলি—পিতা ও অধিনেতা দেবতা।

১। হে পরমেশ্বর! তুমিই আমাদের একমাত্র সম্ভজনীয়। তুমিই আমাদের অন্তর্যামী প্রিয়তম। তোমাকে আমরা অন্তরে অতিথিরূপে পাইয়া গৌরব অনুভব করিতেছি। তোমারই জ্যোতির কণামাত্র পাইয়া চন্দ্র-সূর্য্য দীপ্তিমান হইয়াছে। তোমারই জ্ঞানের কণামাত্র পাইয়া আমাদের অন্তর জ্ঞানে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। আমরা তোমাকে স্মরণ করি, আমরা তোমাকে ভজনা করি।

২। হে অন্নদাতা! তুমি আমাদিগকে প্রতিদিন যথোপযুক্ত পরিমাণে অন্ন প্রদান কর, যাহাতে আমরা আমাদের শরীর পোষণ করিয়া তোমারই প্রিয়কার্য্যের অনুষ্ঠানে জীবন সমর্পণ করিতে পারি। তুমি আমাদিগকে প্রচুর পরিমাণে অন্ন দাও, যাহাতে আমরা আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবকে সেই অন্ন বিতরণ করিয়া তোমার করুণার পরিচয় তাহাদের হৃদয়ঙ্গম করাইতে পারি। তুমি আমাদিগকে সুখ দাও, শান্তি দাও।

৩। আমরা চারিদিকে তোমার প্রিয়কার্য্যসাধনরূপ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছি। তুমি আমাদের সেই সকল যজ্ঞ-অনুষ্ঠানে সহায় হও। তুমি সর্ব্বদা যজ্ঞক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিয়া যজ্ঞসমূহকে বিঘ্নরহিত কর। আমাদের রিপুসকল যেন সেই সমস্ত যজ্ঞে বিঘ্ন উৎপাদন করিতে না পারে।

৪। তুমি আমাদের পিতা। তুমি আমাদিগকে জ্ঞানশিক্ষা দাও। হে দেব! আমাদের পাপসকল মার্জ্জনা কর। আমাদিগকে পাপে পতিত হইতে দিও না—পাপে পতিত হইবার পূর্ব্বেই আমাদিগকে তুলিয়া ধরিও। আমাদিগকে ধনে অর্থে, যশে বিদ্যায়, ধর্ম্মে ও কর্ম্মে, সকল বিষয়ে উন্নত কর। আমরা যেন তোমার সন্তানের উপযুক্ত ভাবে উন্নত মস্তকে জগতে বিচরণ করিতে পারি। আমাদিগকে সর্ব্ববিধ ঋণজাল হইতে মুক্ত করিয়া জীবনদান কর।

৫। হে দীপ্যমান পরমেশ্বর! তুমি আমাদের চিরন্তন নেতা। তোমার বল অক্ষয় ও অপ্রতিহত। আমরা শত্রুদের হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিতেছি না। তুমি আমাদের দিকে তোমার দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত কর। পাপ-পথের পথিকেরা যেন ধর্ম্মের ছদ্মবেশ পরিয়া আমাদিগকে পাপের পথে ভুলাইয়া না লইয়া যায়। কাহারও প্রতি দ্বেষহিংসা যেন আমাদের অন্তরে স্থান না পায়। হিংসাপরায়ণ ব্যক্তিরাও যেন আমাদের প্রতি হিংসা প্রকাশ না করে। আমাদের অন্তরে যেন পশুদিগের ন্যায় জিঘাংসাবৃত্তি স্থান না পায়। আমাদের উপর প্রতিশোধ লইবার ইচ্ছা যেন কাহারও অন্তরে স্থান না পায়।

৬। হে হিরণ্যজ্যোতি! আমাদের অন্তরের ঘন অন্ধকারের প্রাচীর তোমার জ্যোতি দ্বারা বিচূর্ণ করিয়া দাও। আমাদের আত্মাকে তোমার জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান কর। যে সকল রিপু অন্ধকার আনয়নের সহায়তা করিতে উদ্যত হইয়াছে, তুমি তাহাদিগকে বিদূরিত কর। হে প্রভু! দয়া কর—দয়া কর। সেই সকল রিপুগণকে আমাদের উপর প্রভুত্ব করিতে দিও না। তুমিই আমাদের একমাত্র প্রভু।

৭। আমরা তোমার নিকট বল ও বীর্য্য, শক্তি ও তেজ প্রার্থনা করিতেছি, যাহাতে তোমার সন্তানের উপযুক্ত শোভন বেশে জগতে বিচরণ করিতে পারি। তুমিই আমাদের পিতৃপুরুষদিগকে সমস্ত বিপদ আপদ হইতে রক্ষা করিয়া সৌভাগ্যবান করিয়াছিলে। তুমিই তাঁহাদিগকে প্রচুর অর্থ দান করিয়া অতিথিসেবায় শক্তিসামর্থ্য দিয়াছিলে। তোমাকে যে প্রাণের সহিত আহ্বান করিয়াছে, সে-ই সফলকাম হইয়াছে। আমরাও তোমাকে একমনে ডাকিতেছি, তুমি আমাদিগকে সকল বিষয়ে উন্নত ও মহান কর।

৮। তোমার অভয়বাণী আমাদিগকে শোনাও এবং আমাদিগকে নির্ভয় করিয়া দাও। আমরাও আবার তোমার বিজয়পতাকা বহন করিয়া চতুর্দ্দিক জয় করিতে থাকিব এবং তোমার অভয়বাণী সর্ব্বত্র প্রচার করিব।

৯। হে জীবনের অধিনেতা! তোমার জ্যোতি প্রতি মানবের অন্তরে প্রজ্বলিত রহিয়াছে। পূর্ব্বতন আচার্য্যেরা তোমার সেই অরূপ জ্যোতির রূপ কত-না সুন্দর ভাবে ও মন্ত্রে ব্যক্ত করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। তাঁহাদের সেই সকল মন্ত্রের শক্তিবলে আমাদের অন্তর্নিহিত জ্যোতি কত-না উজ্জ্বল হইয়া উঠে। মানব সেই প্রজ্বলিত জ্যোতির ভিতরে তোমারই প্রসন্নমুখের জ্যোতি দেখিতে পাইয়া ভক্তিভরে তোমাকে নমস্কার করে।

১০। তোমার প্রসন্নমুখের জ্যোতি যেমন আমাদের অন্তরে শান্তি প্রদান করে, তোমার রুদ্র মুখের জ্বলন্ত তেজ তেমনই আমাদিগকে ভয়াকুল করে। তোমার সে তেজ কেহই প্রতিহত করিতে পারে না। প্রবর্দ্ধিত পাপও সেই তেজের রশ্মিমাত্রে দগ্ধ হইয়া যায়। অন্তরে যখন পাপ জাগ্রত হয়, তখন তুমি ভয়ানকেরও ভয়ানকরূপে আমাদের সম্মুখে প্রকাশিত হও। হে অন্তর্যামী! আমাদের অন্তরে পাপ উদিত হইলে তুমি তাহা তোমার বজ্রাগ্নিতে দগ্ধ করিও, কিন্তু আমাদের দৃষ্টি হইতে তোমার প্রসন্ন মুখ সরাইয়া লইও না।

৬০। অঞ্জলি—ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক দেবতা।

১। হে ব্রহ্মোপাসকগণ! যে পরমদেবতা এই মহাব্যোমের প্রতি বিন্দু আচ্ছাদিত করিয়া আছেন; যাঁহার মহিমা প্রকৃতির প্রতি অণু-পরমাণুতে সুব্যক্ত হইতেছে, তোমরা সকলে মিলিত কণ্ঠে তাঁহার বিজয় গান কর। চক্ষু খুলিয়া দেখ, তিনি তোমাদের সম্মুখে প্রকাশমান আছেন।

২। হে দেবদেব! তুমি স্বীয় দীপ্তিতে দীপ্যমান। তুমি একহস্তে তোমার অভয় বর, অপর হস্তে তোমার উদ্যত বজ্র লইয়া আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছ দেখিতেছি।

৩। উদ্যত বজ্রের মহাদণ্ড দেখিয়া আমরা সকলে ভীত হইতেছি এবং প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আমরা কায়মনোবাক্যে পাপ পরিত্যাগ করিব। আমাদের দুঃখ শোক, তাপ পরিতাপ সমস্তই দূর হইয়া যাউক।

৪। তুমি আমাদের সম্মুখে তোমার প্রসন্ন মুখ লইয়া উপস্থিত হও; আমাদিগকে তোমার অভয় বর প্রদান কর। আমাদিগকে শত্রুসংহারের উপযুক্ত বল ও সামর্থ্য প্রদান কর। তোমার মহিমা ও কীর্ত্তি ঘোষণা করিবার উপযুক্ত বল ও শক্তি প্রদান কর। বলহীন ব্যক্তি তোমাকে পাইতে পারে না। আমাদিগকে তোমার বলে বলীয়ান কর। আমরা তোমাকে নমস্কার করি।

৫। তুমি যেমন মহাব্যোমকে ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছ, তেমনি তুমি আমাদের আত্মাকেও ব্যাপ্ত করিয়া অবস্থিতি কর। তুমি অজর, অমর ও অক্ষর। তোমার ক্ষয় নাই, বিনাশ নাই, ধ্বংস নাই। প্রকৃতিতে তোমার অপ্রতিহত শক্তি ও অপার প্রেমের কি আশ্চর্য্য খেলা চলিতেছে। তোমারই তেজের কণামাত্র সমস্ত ওষধি-বনস্পতি সমস্ত জীবজন্তুর মধ্যে অন্তর্নিহিত থাকিয়া তেজ বিধান করিতেছে।

৬। তোমার একটী তেজবিন্দুমাত্র অন্তরে ধারণ করিবার ফলে আমাদের তেজ, বল ও বীর্য্য এত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে যে, আমাদের নামে দ্যুলোক ও ভূলোক কম্পিত হইতেছে; আমাদের মুখ হইতে বাণী শুনিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া আছে। তোমার নামে আমরা যে মঙ্গল পথ দেখাইতেছি, সেই পথ অবলম্বন করিতে সকলই অগ্রসর হইতেছে।

৭। তুমি সত্যস্বরূপ। তোমার সত্যের তেজে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া মিথ্যা, পাপ, অনাচার প্রভৃতি বিক্ষিপ্ত হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতেছে। একমাত্র সত্যের বলে বিশ্বজগত বিধৃত হইয়া স্থিতি করিতেছে। সত্যের বলে ভূলোক দ্যুলোক বিধৃত হইয়া স্থিতি করিতেছে।

৮। সংসারে যখন অধর্ম্ম প্রবল হইয়া উঠে এবং ধর্ম্ম অন্তর্হিত হইবার উপক্রম করে, তখন তোমার রুদ্র তেজে জগতসংসার কম্পিত হইতে থাকে। তোমার রুদ্র তেজে সমস্ত জগত উষ্ণ হইয়া উঠে। তখন আবার তুমিই অধর্ম্মকে দগ্ধ করিয়া ধর্ম্মকে সংসারে প্রতিষ্ঠিত কর এবং তোমার শান্তিধারা বর্ষিত হইয়া জগতকে আবার সুশীতল করিয়া তুলে।

৯। জগতে তোমার সিংহাসন সুপ্রতিষ্ঠিত। আকাশ যেমন ধ্রুব, তোমার আসনও তেমনি ধ্রুব। তোমার আসনতলই আমাদের একমাত্র আশ্রয়। পরলোকে তুমিই আমাদের একমাত্র গতি।

১০। আমাদের জ্ঞানের আকর একমাত্র তুমি। আমাদের মন তোমাকে ধারণ করিতে গিয়া প্রতিনিবৃত্ত হয়, কিন্তু আমাদের সর্ব্ববিধ মননের একমাত্র নিয়ন্তা তুমি। আমাদের বাক্য তোমাকে বর্ণনা করিতে গিয়া প্রতিনিবৃত্ত হয়, কিন্তু আমরা যাহা কিছু বলি, সমস্ত তোমা হইতেই আসিয়াছে।

১১। তোমার ভয়ে বায়ু সঞ্চলিত হইতেছে। তোমার ভয়ে সূর্য্য প্রতিদিন যথাসময়ে উদিত হইতেছে। তোমার ভয়ে অগ্নি উত্তাপ দিতেছে। তোমারই ভয়ে মেঘ বারি বর্ষণ করিতেছে।

১২। তুমি সর্ব্বব্যাপী। দ্যুলোক, ভূলোক ও অন্তরীক্ষ ব্যাপ্ত করিয়া তুমি অবস্থিতি করিতেছ। তুমি আমাদের শুভবুদ্ধিদাতা। তুমি আমাদের সমস্ত পাপ হরণ কর। তুমিই আমাদের মনের নিয়ন্তা। তুমি আমাদের আত্মার অন্তস্তম প্রদেশেরও কথা জানিতেছ।

১৩। তুমি যখন আমাদের অন্তরে তোমার আসন প্রতিষ্ঠিত কর, তখন তোমার জ্যোতিতে আমাদের অন্তর ও বাহির সমুদ্ভাসিত হইয়া উঠে। তোমার সেই জ্যোতিতে বিমুগ্ধ হইয়া ভ্রান্ত মানব মস্তক অবনত করে।

১৪। হে দেব! হে পিতা! আমরা তোমাকে কাতর প্রাণে আহ্বান করিতেছি। তুমি আমাদের আত্মাতে আসিয়া শীঘ্র আমাদের প্রাণকে শীতল কর।

১৫। তোমার প্রীতিকাম হইয়া আমরা তোমার প্রিয় কার্য্যের অনুষ্ঠানে আপনাদিগকে নিত্য নিরত রাখিয়াছি। তুমি আমাদের প্রভু। আমাদিগকে শতবর্ষ আয়ু প্রদান কর, যাহাতে এই দীর্ঘকাল তোমার উপাসনা করিয়া এই দুর্লভ মানবজন্ম সার্থক করিতে পারি।

ব্রহ্মের আত্মপ্রকাশ।

(শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ)

ডাঃ মার্টিনোর একটী উপদেশের ভাব গ্রহণ করিয়া লিখিত।*

বাইবেল-গ্রন্থে লিখিত আছে যে, যীশু একবার বলিয়াছিলেন—"হে ব্রহ্মাণ্ডপতি, ধন্য তুমি যে, ধর্ম্মের গূঢ় তত্ত্ব সকল জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান লোকদের নিকট হইতে প্রচ্ছন্ন করিয়া শিশুদের নিকট প্রকাশ করিয়াছ।" যে তত্ত্ব পণ্ডিতেরা বুঝিতে অক্ষম তাহা শিশুদের কাছে সহজ—এ কথাটা আপাততঃ বড় আশ্চর্য্য বলিয়া লাগে; আর তাহা যদি সত্য হয় তবে সেজন্য যীশু ভগবানকে কেন ধন্যবাদ দিলেন তাহা আরও অধিক বিস্ময়জনক বলিয়া মনে হয়। জ্ঞানবুদ্ধি ত মানবের ভূষণ। যদি তাহা হয় তবে যীশু জ্ঞান-বুদ্ধিকে তুচ্ছ করিলেন কেন? সত্য কি উদাসীনতার পুরস্কার? ইহাও কি কখনও সম্ভব যে মানুষ আলোকের অন্বে-

* God Revealed unto Babes.

যণ করিয়া গভীরতর অন্ধকারে নিমগ্ন হয়? সত্য-লাভের জন্য চেষ্টার ফল কি এই যে, সত্য মানবের নিকট হইতে সুদূরে সরিয়া যায়? চিন্তাশীল ও সুপণ্ডিত ব্যক্তি অপেক্ষা চিন্তাহীন মূর্খের পক্ষে কি ধর্ম্মের তত্ত্ব অধিক সুলভ? অনেক মূর্খ অথচ গোঁড়া খৃষ্টীয়ান, সুপণ্ডিত ও চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের কাছে তর্কে পরাস্ত হইয়া যীশুর উক্তি স্মরণ পূর্ব্বক সান্ত্বনা ও গৌরব অনুভব করেন। কিন্তু যীশুর কথার অর্থ কি বাস্তবিক এই যে স্বর্গে কেবল অসভ্য ও বর্ব্বরদিগেরই অধিকার? বুদ্ধিমান ও পণ্ডিত লোকদের প্রতি আমরা যে স্বভাবতই শ্রদ্ধাভক্তি প্রদর্শন করি তাহা বিসর্জ্জন দিয়া যাহাদের ভাষার অর্থ চীৎকার, যাহাদের জ্ঞানের পরিবর্ত্তে সঙ্কীর্ণ কুসংস্কারই সম্বল, এবং চিন্তার অভাবে যাহারা কথায় কথায় সাক্ষাৎ আদেশের আশ্রয় গ্রহণ করে—আমরা কি ধর্ম্মরাজ্যে তাহাদিগকেই সর্ব্বোচ্চ আসন প্রদান করিব?

এ কথা সত্য নয় যে বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞান ও চিন্তার নিকট ধর্ম্মের তত্ত্ব প্রচ্ছন্ন থাকে। প্রকৃত কথা এই যে অহংকারী ও স্বার্থপর লোক ভগবানের সন্ধান পায় না। এই অহংকার ও স্বার্থপরতা পণ্ডিতেরও থাকিতে পারে, মূর্খেরও থাকিতে পারে। যীশুর কথার অর্থ এই যে নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়াও মানুষ ধর্ম্ম হইতে বঞ্চিত হইতে পারে, এবং দর্শন-বিজ্ঞান না জানিয়াও মানুষ ধর্ম্মলাভে সমর্থ হয়। অল্প আলোচনা করিলেই এ কথাটী সুস্পষ্ট হইবে।

শিশুর জ্ঞান সহজ, প্রবীণের জ্ঞান যুক্তিতর্কের ফল। শিশু বর্ত্তমানের মধ্যেই বাস করে, অতীত ও ভবিষ্যতের চিন্তায় আকুল হয় না। চক্ষুকর্ণের মধ্য দিয়া প্রকৃতিজননী শিশুর নিকট মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্তে নব নব মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হন। সংশয় ও সন্দেহ শিশুকে উৎপীড়িত করে না। সে বিনা তর্কে, বিনা চিন্তায় ভাবের স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে বিস্ময়ের রাজ্য হইতে বিস্ময়ের রাজ্যে চলিয়া যায়। কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সহিত সে অন্যের কাছে অনেক কথা শুনিতে থাকে, জগতের ঘটনাপ্রবাহ লক্ষ্য করিয়া এবং প্রকৃতির নিয়ম অবধারণ করিয়া কত ভবিষ্যৎ বিষয় নির্ণয় করিতে সমর্থ হয়, বিশ্বের বিভিন্ন বস্তুকে নানা শ্রেণীতে বিভক্ত করে, তখন কত নূতন নূতন সম্ভাবনা তাহার নিকট উদঘাটিত হয়। তখন মানুষ সহজ কথা ভুলিয়া কেবল বিচারের সাহায্যে সকল তত্ত্বের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হয়। যাহা অতি নিকট, যাহা অনুক্ষণ চক্ষুর সম্মুখে বর্ত্তমান তাহাকে আমরা মনে করি দূর, যাহা অতি সহজ তাহাকে আমরা বহু তর্ক-বিতর্কের পশ্চাতে বলিয়া কল্পনা করি। শৈশবে একটী প্রত্যক্ষ দর্শন, একটী স্বাভাবিক নির্ভরের ভাব থাকে, ইহারই সাহায্যে শিশুরা স্বর্গের তত্ত্ব লাভ করে। বয়োবৃদ্ধির সহিত এগুলি হারাইয়া যায়। ইহাই জ্ঞানবৃদ্ধির বিড়ম্বনা। সূত্র দিয়াই বস্ত্র রচনা হয়, কিন্তু সেই বস্ত্র দিয়া চক্ষু বাঁধিলে যেমন আর সূত্র লক্ষ্য করা যায় না, সেইরূপ যে সহজজ্ঞান সকল চিন্তার মূলে, আমরা তর্ক-বিতর্কের দ্বারা এমন প্রপীড়িত হই যে সেই সহজজ্ঞানকে আমরা হারাইয়া ফেলি।

বিজ্ঞান জগতের ভিন্ন ভিন্ন সামগ্রীগুলিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করে এবং বিশ্বের ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে প্রাকৃতিক নিয়ম ও কার্য্যকারণশৃঙ্খলা অবধারণ করে। পদার্থসকলের শ্রেণীবিভাগ আর ঘটনাবলীর কার্য্য-কারণসম্বন্ধনির্ণয়—এই দুটাই বিজ্ঞানের বিষয়। কিন্তু ব্রহ্ম ত কোন পদার্থ নহেন, কোন ঘটনাও নহেন। যাহা সীমাবিশিষ্ট, যাহা বিশেষ বিশেষ স্থানে নিবদ্ধ, যাহার উৎপত্তি ও বিনাশ আছে, সেইরূপ সামগ্রীই বিজ্ঞানের বিষয়। কিন্তু যিনি বহুর মধ্যে অন্যতম নহেন, কিন্তু সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বগত; যিনি সকল বস্তুর আশ্রয় এবং সকল ঘটনার অবলম্বন; যিনি আদি-অন্তহীন এবং সকল ভঙ্গুর ও নশ্বরের মধ্যে একমাত্র চিরন্তন ও কালাতীত,—তিনি বিজ্ঞানের বিষয়ই হইতে পারেন না। তিনিই বহির্জ্জগতে একমাত্র শক্তি। তিনিই অন্তর্জ্জগতে স্বাধীন মানবাত্মার একমাত্র আদর্শ। সৃষ্টির মধ্যে যে নিগূঢ় মঙ্গল অভিপ্রায় নিহিত রহিয়াছে সে অভিপ্রায় তাঁহারই। তিনিই সেই নিত্যসিন্ধু—মানবইতিহাসের এক-একটী ঘটনা যার এক-একটী তরঙ্গ মাত্র। তিনি প্রতিমুহূর্ত্ত আমাদিগকে বেষ্টন

করিয়া আছেন এবং দেহমনপ্রাণ পূর্ণ করিয়া বর্ত্তমান; কেবল আমাদেরই হৃদয়ের অবস্থাভেদে আমরা কখনও তাঁহাকে দর্শন করি, আবার কখনও বা তাঁহাকে হারাইয়া ফেলি। এই দর্শন ও অদর্শনের মূলে তাঁহার আবির্ভাব ও তিরোধান নহে। যাঁহারা তাঁহাকে অগ্রাহ্য করেন বা অস্বীকার করেন তাঁহাদেরও হৃদয়ে তিনি নিত্যকাল বিরাজিত, এবং যাঁহারা তাঁহাকে স্বীকার করেন তাঁহাদের ভাগ্যেও তাঁহার দর্শনলাভ কত বিরল ও বিদ্যুৎপ্রকাশের মত কত ক্ষণিক! যখন আমরা তাঁহাকে দর্শন করি তখন অন্তরের অন্তরে পরমাত্মারূপেই দর্শন করি। এমন শুভ মুহূর্ত্ত সত্য সত্যই আসে, যখন প্রকৃতির মুখে স্বর্গের সৌন্দর্য্য বিকাশিত হয় এবং মানবের ইতিহাসে বিধাতার হস্ত দেখিয়া আমরা বিকম্পিত হই; যখন পাপ-তাপ দুঃখ-দৈন্যের বেদনায় আমরা তাঁহারও মর্ম্মবেদনা অনুভব করি; এবং যখন তাঁহারই ইঙ্গিতে আমরা নূতন পথে জীবনের নূতন লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হই। আমরা যে নূতন কৌশল অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে দর্শন করি তাহা নহে। কিন্তু তিনিই আমাদিগের নিকট আত্মপ্রকাশ করেন এবং অতি সহজভাবে আমাদিগকে তাঁহার অপূর্ব্ব সত্তায় পূর্ণ করেন। তাঁহারই পুণ্যালোকে তাঁহাকে দেখিয়া আমরা কৃতার্থ ও সঞ্জীবিত হই। তাঁহার দর্শনের জন্য আমাদিগকে কোন দূর তীর্থে যাইতে হয় না, এবং কোন বিশেষ শুভ দিনের জন্যও প্রতীক্ষা করিতে হয় না। এই ক্ষণই শুভক্ষণ, এই স্থানটাই পুণ্যতীর্থ ইহা বিশ্বাসপূর্ব্বক কেবল সরলভাবে তাঁহার ইচ্ছার অনুবর্ত্তী হইতে হয়, বিনম্র হৃদয়ে ও ভক্তিভরে তাঁহারই চরণে আপনাকে উৎসর্গ করিতে হয়।

বাহির হইতে ভক্তের জীবন দেখিলে মনে হয় তিনি যে বাসনা কামনা ও আসক্তি অতিক্রম করিয়াছেন তাহার মূলে হয় ত কত সঙ্কল্প, কত সংগ্রাম, কত কঠোর তপস্যা। কিন্তু বুঝি বা এ অনুমান ভুল, বুঝি বা এ অনুমান আমাদের কল্পনা। ভক্তজীবনের মূলে হয় ত বা সহজ প্রেম, সরল আত্মদান, কেবল মাত্র উপস্থিত কর্ত্তব্য পালনের নিষ্ঠা। পৃথিবীর দৃষ্টিতে যাঁহারা দুর্জ্জয় বীর তাঁহাদের জীবনের গূঢ় কথা এই যে পরমেশ্বরের নিকটে তাঁহারা একান্ত শিশু। খৃষ্টীয় সমাজে দেখা যায় যে, এক-এক জন সম্ভ্রান্তবংশীয় মহিলা নানা গুণে গুণবতী ও নানা বিদ্যায় বিদুষী হইয়াও সংসারের সকল সাধ বিসর্জ্জন দিয়া এবং ধনৈশ্বর্য্যপূর্ণ গৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক হাঁসপাতালে রোগীর সেবায় জীবন উৎসর্গ করিতেছেন। এ কথা ভাবিলেও বিস্ময়ের অবধি থাকে না। সাময়িক ভাবের উত্তেজনায় একটা স্বার্থ বিসর্জ্জন করা বা প্রাণের মায়া পরিত্যাগ করিয়া একটা খুব দুঃসাহসের কাজ করা বরং কল্পনা করা যায়; কিন্তু দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর অক্লান্তভাবে ও প্রফুল্লমুখে নানা প্রকার ঘৃণিত রোগে জর্জ্জরিত নিতান্ত অচেনা রোগীদিগের পরিচর্য্যা যে কি ব্যাপার তাহা ভাবা কঠিন। মনে হয় বুঝি বা এই জীবনব্যাপী সেবাব্রতের পশ্চাতে কত কঠোর তপস্যা, কত দীর্ঘ সাধনা! কিন্তু হয় ত তাহা নহে, হয় ত সহজ ভাবে ভগবানের ইচ্ছাকে মস্তকে গ্রহণ করাই এই সেবাব্রতের গূঢ় তত্ত্ব। হয় ত বা খুঁজিয়া খুঁজিয়া জীবনের পথ বাহির করিবার জন্য তাঁহারা অধীর হন না, এবং যে পথে চলিয়াছেন সে পথ যে কত দীর্ঘ এবং কোথায় তাহার অবসান তাহা চিন্তাও করেন না। জননী যেমন ক্ষুদ্র শিশুর হাতখানি ধরিয়া লইয়া যান, হয় ত বা তাঁহারা অনুভব করেন যে পরম জননী তেমনি করিয়া তাঁহাদের হাত ধরিয়াছেন। আর ভয়ও নাই ভাবনাও নাই। তাই তাঁহাদের মন এত নিশ্চিন্ত এবং মুখ এত প্রফুল্ল। অথচ কি আশ্চর্য্য তেজ, কি অপূর্ব্ব দৃঢ়তা! বাস্তবিক যিনি সম্পূর্ণ রূপে আপনাকে ভগবানের হস্তে সমর্পণ করেন তিনিই পরম পরিপূর্ণ জীবন লাভ করেন। যিনি আপনার সমুদয় অধিকার বিসর্জ্জন দেন তিনিই প্রকৃত স্বাধীনতা প্রাপ্ত হন। যিনি প্রতি মুহূর্ত্ত জীবন্ত প্রভুর আদেশের অনুবর্ত্তী হইতে প্রস্তুত, তিনিই জনসমাজের অধিনায়ক হইয়া থাকেন।

মানবের মহত্ত্ব দুই প্রকার—নৈতিক ও আধ্যাত্মিক। নৈতিক মহত্ত্বের মূলে কঠোর তপস্যা; আধ্যাত্মিক মহত্ত্বের মূলে সরল বিশ্বাস। এক

শ্রেণীর মহাপুরুষেরা চেষ্টা করিয়া বড় হন, আর এক শ্রেণীর মহাপুরুষেরা আত্মচেষ্টা পরিহার পূর্ব্বক ব্রহ্মকৃপার উপরে নির্ভর করেন। এক জন লক্ষ্য স্থির করেন এবং বিঘ্ন বিপত্তি অতিক্রমের উপায় উদ্ভাবন করেন; দ্বিতীয় ব্যক্তির লক্ষ্য ভগবানের ইঙ্গিত, তিনি দিনের পর দিন ভগবানের হস্তে যন্ত্রবৎ পরিচালিত হন। দ্বিতীয় ব্যক্তি যে সম্পূর্ণরূপে আপনার ইচ্ছাকে বিসর্জ্জন দেন, তাহা নহে, কিন্তু শিশুর মত সরল হন। লক্ষ্যসিদ্ধির জন্য তাঁহার কোন চিন্তা বা উদ্বেগ থাকে না। উপায় হইয়া যাইবে, ভগবান কোন একটা উপায় করিয়া দিবেনই দিবেন—তাঁহার এই ভাব। এই উভয় প্রকার মহত্বেই মানবের ইতিহাস সমুজ্জ্বল। কিন্তু যে সকল মহাজনেরা কঠোর সংকল্প ও দীর্ঘ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন তাঁহাদের অপেক্ষা যাঁহারা সহজ নির্ভরের পথ অবলম্বন করিয়াছেন তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ। মানুষ যদি দৃঢ় প্রতিজ্ঞার সহিত কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় তাহার উৎসাহ ও উদ্যমের মধ্যে একটা মহাশক্তি সঞ্চারিত হয় সত্য, কিন্তু যে ব্যক্তি ভগবচ্চরণে আত্মবিসর্জ্জন করিয়া নিশ্চিন্ত ও নির্ভয় হয় তাহার হৃদয়ে যে দুর্জ্জয় বল অবতীর্ণ হয় তাহার সহিত প্রথমোক্ত শক্তির তুলনাই হয় না। যে ব্যক্তি আপনাকে বিধাতার হস্তের যন্ত্র বলিয়া মনে করে তাহার নিকটে জগতের সকল বিঘ্ন পরাজিত।

সেইরূপ ধর্ম্মের তত্ত্ব ও অনন্তের রহস্য ভেদ করিবার জন্য যে ব্যক্তি যত উৎকণ্ঠিত, হয় ত বা তাহার চেষ্টা সেই পরিমাণে বিফল হয়। যে আলোকে ব্রহ্মাণ্ড প্লাবিত তাহার সন্ধান করিতে কোথায় যাইবে? যে রজনী স্নেহের পক্ষে তোমাকে ঢাকিয়া আছে অন্ধকার ঠেলিয়া সে রজনীর অন্বেষণ কি বিড়ম্বনা! শান্ত হও, স্থির হও, বর্ত্তমান মুহূর্ত্তের সৌন্দর্য্যে ডুবিয়া যাও। প্রভু পরমেশ্বরের ইঙ্গিতের জন্য অপেক্ষা করিয়া থাক। হৃদয়ের পবিত্রতার জন্য প্রার্থনা কর। তোমার শূন্য প্রাণ পূর্ণ হইবে। যাহারা "উন্নতি" সম্বন্ধে সুদীর্ঘ বক্তৃতা করে, ধর্ম্মরাজ্যে তাহারাই সকলের পশ্চাতে পড়িয়া থাকে; যাহারা অতিরিক্ত "সত্য সত্য" বলিয়া চীৎকার করে ও "স্বাধীন চিন্তার" গর্ব্ব করে ধর্ম্মের মূল কথাই তাহারা বুঝে নাই।

অনন্তস্বরূপ ত কোন গৃহকোণে লুক্কায়িত নহেন এবং তিনি প্রাচীনকালেও আবদ্ধ নহেন। অণুবীক্ষণ দূরবীক্ষণ যন্ত্রাদির আরও উন্নতি হইলে যে আমরা তাঁহাকে আরও সুস্পষ্ট দেখিতে পাইব তাহাও নহে। তিনি যদি দর্শনবিজ্ঞানের বিষয় হইতেন তবে ত সাধারণ লোকের পক্ষে বড় নিরাশার কথা হইত। অনেক বিদ্বান পণ্ডিত ব্যক্তিকে বলিতে শুনা যায় যে "এত লেখাপড়া শিখিয়া ও শাস্ত্রালোচনা করিয়াও যদি আমরাই ধর্ম্মের কথা তেমন ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলাম না, তবে অজ্ঞান ও মূর্খ লোকেরা ধর্ম্মের তত্ত্ব কি বুঝিবে?" কিন্তু বিশ্বাস ত পাণ্ডিত্যের চরম পুরস্কার নয়। যীশু বলিয়াছেন যে "যাহারা নির্ম্মলচিত্ত তাহারাই ভগবানের দর্শন লাভ করিবে।" তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য সূক্ষ্ম চিন্তা, নানা ভাষায় ব্যুৎপত্তি, নানা শাস্ত্রে পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন নাই। ধর্ম্মজীবন দর্শনবিজ্ঞানের অতীত। বাস্তবিক মানুষের বিশ্বাস চিন্তার পূর্ব্বগামী, অর্থাৎ চিন্তার উন্মেষ হইবার পূর্ব্বে শিশুর ধর্ম্মবিশ্বাসের উন্মেষ হইয়া থাকে। পরে তর্কবিতর্কের চক্রে পড়িয়া সে সহজ ধর্ম্মবিশ্বাস হারাইয়া ফেলে এবং সংশয়ের কূপে পতিত হইয়া অশেষ দুঃখ ভোগ করে। সেই অন্ধকার কূপ হইতে তাহাকে উদ্ধার করিবার জন্য যুক্তিবিচাররূপ অনেক বংশরজ্জুর প্রয়োজন হয়। সংশয়বুদ্ধি যে সকল কঠিন কঠিন প্রশ্ন উত্থাপিত করে তাহার উত্তর দেওয়া সহজ নহে। সেই সকল কূট প্রশ্নের মীমাংসার জন্য সূক্ষ্ম চিন্তার প্রয়োজন। কিন্তু সন্দেহভঞ্জন হইলেই যে আমরা ধর্ম্মজীবন লাভ করি তাহাও নহে। সন্দেহ ভঞ্জন হইলে আমরা প্রকৃতিস্থ হই মাত্র, আমাদের আত্মা যেন রোগমুক্ত হইয়া স্বাভাবিক স্বাস্থ্য লাভ করে মাত্র। প্রবীণকে শিশুর সহজ ধর্ম্মবিশ্বাস প্রদান করাই বিদ্যাবুদ্ধির সর্ব্বোচ্চ অধিকার, দর্শনবিজ্ঞানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গৌরব। বালকের নিকট যে স্বর্গ উন্মুক্ত থাকে প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানীর নিকট সেই স্বর্গ আরও সমুজ্জ্বল মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হয়। বুদ্ধি যতদিন হৃদয়ের বাণীকে তুচ্ছ করে অর্থাৎ যতদিন

বুদ্ধি ও হৃদয়ের মধ্যে বিরোধ চলিতে থাকে, ততদিন সন্দেহের মেঘ উঠিয়া আমাদের চক্ষু হইতে ধর্ম্মের সত্যকে ক্রমাগত আচ্ছন্ন করিতে থাকে, কিন্তু স্বর্গের বায়ু সেই মেঘকে বারম্বার দূর করিয়া দেয়। এই আলোক ও অন্ধকার এই বিশ্বাস ও সংশয়ের নিত্য আন্দোলন হইতে মুক্তিলাভের জন্য শিশুর সরল ভাব যত প্রয়োজন দার্শনিকের পাণ্ডিত্য তত প্রয়োজন নহে। বুদ্ধির দ্বারা অনন্তকে ধারণ করিবার চেষ্টা বৃথা। এ পথে মানুষ সহজ বিশ্বাস হইতে স্খলিত হইয়া অশেষ প্রকারে বিড়ম্বিত হয়। কিন্তু বিশ্বাস যাহার সরল ও চিত্ত যাহার নির্ম্মল ঈশ্বরের স্বর্গরাজ্য তাহার অন্তরে।

পরিচয়।

খাম্বাজ—খং

(শ্রীঅতুলপ্রসাদ সেন বার-এট-ল)

কে যেন আমারে বারে বারে চায়।
আমি ত চিনি নে তারে, সে চেনে আমায়।
যখন থাকি ঘুমঘোরে,
কে দোরে আঘাত করে ;
'কে তুমি' বলে ডাকিলে কে যেন পালায়।
কুসুমের গন্ধে রূপে
সে আসে গো চুপে চুপে—
মেঘের আড়াল হতে ডাকে আয় আয়।
কত প্রেমে কত গানে
সে যেন আমারে টানে—
চলেছি বিরহী তাই কে যেন কোথায়!
হে মোর অচেনা বঁধু
লুকায়ে থেকোনা শুধু
এসো—করি পরিচয় মালায় মালায়॥

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ

(শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ এম-এ)

বাঙ্গালার সাহিত্যাকাশ হইতে আর একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক খসিয়া পড়িয়াছে। যাঁহার দেশপ্রেমোদ্দীপক নাটকাবলী একদিন বঙ্গবাসীর হৃদয়ে দেশাত্মবোধ জাগরিত করিতে সাহায্য করিয়াছিল, যাঁহার হাস্যরস-সমুজ্জ্বল প্রহসনগুলি একদিন নির্ম্মল 'শুভ্র সংযত হাস্য'-রসে বঙ্গদেশ প্লাবিত করিয়াছিল, যাঁহার সুমধুর ব্রহ্মসঙ্গীতগুলি অর্দ্ধ শতাব্দীকাল ব্যাপিয়া কত অশান্ত হৃদয়ে শান্তিবারি সেচন করিয়াছে এবং চিরদিন করিবে, যাঁহার গভীর চিন্তা-প্রসূত সন্দর্ভাবলী কত নূতন নূতন ভাব ও চিন্তার প্রস্রবণ উন্মুক্ত করিয়াছে, যাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রম ও অদ্ভুত অধ্যবসায়ের ফলে বঙ্গীয় পাঠকগণ সংস্কৃত, ফরাসী, মারাঠী প্রভৃতি বহু সাহিত্য-রত্নখনির ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ করিয়াছেন, সাহিত্যের সেই অবিশ্রান্ত সেবক, শিল্প ও ললিতকলার সেই একনিষ্ঠ সাধক, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সম্প্রতি ইহলোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক আনন্দধামে প্রয়াণ করিয়াছেন।

বংশবিবরণ। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মহাবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কলিকাতা যোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের পরিচয় জ্ঞাত নহেন, বঙ্গদেশে এরূপ শিক্ষিত ব্যক্তি নাই। বাঙ্গালীর ভাব ও চিন্তারাজ্যে ঠাকুরবংশীয়গণ শতাব্দীকাল ধরিয়া অক্ষুণ্ণ প্রতাপে রাজত্ব করিয়াছেন এবং বহুদিন ব্যাপিয়া করিবেন। রাজা রামমোহন রায়ের পর, সমাজের উন্নতির জন্য, রাজনীতিক অধিকার সম্প্রসারণের জন্য, উচ্চশিক্ষার বিস্তারের জন্য, দেশীয় শিল্প ও ললিতকলার উৎকর্ষ সাধনের নিমিত্ত যে মহাপুরুষ তাঁহার সমগ্র শক্তি ও অতুল ঐশ্বর্য্য নিয়োজিত করিয়াছিলেন, যিনি সকল বিষয়েই যথার্থ 'প্রিন্স্' নামের যোগ্য, সেই দ্বারকানাথ ঠাকুর জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পিতামহ। দ্বারকানাথের তিন পুত্র—দেবেন্দ্রনাথ, গিরীন্দ্রনাথ ও নগেন্দ্রনাথ,—বংশগৌরব কেবল অক্ষুণ্ণ নহে, উজ্জ্বলতর করিয়াছিলেন। সকল সৎকার্য্যে অগ্রণী, দানে মুক্তহস্ত, সাধুতায় অপরাজেয়, জ্ঞান ও ধর্ম্মের সাধনায় একনিষ্ঠ দেবেন্দ্রনাথকে দেশবাসী "মহর্ষি" আখ্যা প্রদান করিয়া তাঁহাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছিলেন। শিল্প, বিজ্ঞান, নাট্যকলা ও সাহিত্যে অনুরাগ, গভীর আশ্রিত-বাৎসল্য ও দীনজনে দয়া, গিরীন্দ্রনাথের নাম তাঁহার উপযুক্ত পুত্রদ্বয় গণেন্দ্রনাথ ও গুণেন্দ্রনাথের নামের সহিত বাঙ্গালীর নিকট স্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। যাঁহার সুন্দর আকৃতি এবং তদধিক সুন্দর হৃদয় দ্বারকানাথের ইংলণ্ড প্রবাসকালে কত বিলাসলালিতা ডিউক-পত্নীর হৃদয়ে অপূর্ব্ব বাৎসল্য ভাবের উদ্রেক করিয়াছিল, যিনি পরের দুঃখ বিমোচনার্থ স্বয়ং ঋণজালে জড়িত হইয়াও মুক্তহস্তে দান করিতেন, এবং বেতন হইতে তাঁহার অপরিমিত ব্যয় সঙ্কুলান করা অসাধ্য বলিয়া যিনি সহকারী কলেক্টর অব্ কাষ্টমসের (তৎকালে) দুর্ল্লভ পদ স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করেন,—সেই নগেন্দ্রনাথও অকালে স্বর্গারোহণ না করিলে বাঙ্গা-

নীর সামাজিক জীবনের উপর তাঁহার অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্বের প্রভাব চিরস্থায়ীরূপে অঙ্কিত করিয়া যাইতে পারিতেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ঔরসে, সাধ্বী সারদা দেবীর গর্ভে যথাক্রমে দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, হেমেন্দ্রনাথ, বীরেন্দ্রনাথ সৌদামিনী, সুকুমারী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, শরৎকুমারী, স্বর্ণকুমারী, বর্ণকুমারী, সোমেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন। রত্নগর্ভা দেবী সারদার পুত্রদিগকে পূর্ব্বপুরুষগণের নামোল্লেখ করিয়া পরিচয় দিতে হয় না—তাঁহারা সকলেই স্বনামধন্য। 'স্বপ্নপ্রয়াণে'র কবি সেই জন্য গর্ব্বভরে আত্মপরিচয় দিয়াছিলেন;—

"ভাতে যথা সত্য হেম মাতে যথা বীর,
গুণ জ্যোতি হয়ে যথা মনের তিমির;
নব শোভা ধরে যেথা সোম আর রবি,
সেই দেব-নিকেতন আলো করে কবি।"

জন্ম ও বাল্যজীবন। সন ১২৫৫ সালের ২২শে বৈশাখ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে তিনি গৃহস্থিত পাঠশালায় জনৈক গুরুমহাশয়ের নিকট প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। পরে অগ্রজ হেমেন্দ্রনাথের তত্ত্বাবধানে জনৈক গৃহশিক্ষকের নিকট ইংরাজি পাঠ আরম্ভ করেন। হেমেন্দ্রনাথ সংস্কৃত সাহিত্যের এবং পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। তিনি সরল বাঙ্গালায় বিজ্ঞানের অনেক বিষয় বিশদ ও মনোজ্ঞ ভাবে লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি ফরাসী ভাষাতেও ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। হীরাসিং নামক জনৈক পাঞ্জাবীর নিকট তিনি কুস্তি শিখিয়াছিলেন এবং শারীরিক বলের জন্য খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। হেমেন্দ্রনাথ জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে অনেক প্রকার ব্যায়াম অভ্যাস করাইয়াছিলেন এবং সন্তরণ বিদ্যাও শিখাইয়াছিলেন। বাল্যকালে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ অত্যন্ত রুগ্ন ও দুর্ব্বল ছিলেন—কিন্তু যৌবনে তিনি অশ্বারোহণ শীকার প্রভৃতি পুরুষোচিত ক্রীড়ায় আসক্ত হইয়াছিলেন। হেমেন্দ্রনাথের বিদ্যাশিক্ষারীতি অতি কঠোর ছিল। তিনি সময়ের মূল্য বুঝিতেন এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথের খেলিবার সময় সঙ্কোচ করিয়া পড়িবার সময় বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাতে হিতে বিপরীত হয়। বাল্যকালে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পাঠ্য পুস্তক পাঠে বিতৃষ্ণা জন্মে।

শিক্ষা। অতঃপর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হন। সেন্টপল্‌স্ স্কুল, মণ্টেগু অ্যাকাডেমী, হিন্দু স্কুল ও কলিকাতা কলেজে (পরে আলবার্ট কলেজ নামে খ্যাত) বিদ্যাশিক্ষা করেন। ঘন ঘন বিদ্যালয় পরিবর্ত্তনের জন্য তাঁহার পাঠে যে বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছিল তাহা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হয়। হিন্দু স্কুলে পাঠকালে তিনি পাঠ্য পুস্তকে মনোযোগ না দিয়া শিক্ষকদিগের ছবি আঁকিতেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ স্বচেষ্টায় রেখাচিত্র অঙ্কিত করিতে শিখেন। এই চিত্রাঙ্কনবিদ্যানুশীলনের ফলে আমরা সারদামঙ্গলের কবি বিহারীলালের এবং রবীন্দ্রনাথের কৈশোর ও যৌবনের প্রতিকৃতি দেখিবার সুযোগ পাইয়াছি। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা কলেজ হইতেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা প্রদান করেন এবং পাঠ্য পুস্তকে চিরদিন অবহেলার জন্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার বিষয়ে সম্পূর্ণ নিরাশ হইলেও আশ্চর্য্যরূপে সাফল্যলাভ করেন। কলিকাতা কলেজ ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয় এবং উহাতে মনীষী প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের (ডব্লিউ, সি, বনার্জীর) পিতৃব্য উকীল ভৈরব বন্দ্যোপাধ্যায়, সার তারকনাথ পালিত প্রভৃতি শিক্ষাপ্রদান করিতেন এবং স্বয়ং কেশবচন্দ্র নীতি উপদেশ প্রদান করিতেন।

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর উচ্চশিক্ষার জন্য জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রবেশলাভ করেন। তাঁহার সহপাঠিগণের মধ্যে ভারতবিখ্যাত রমেশচন্দ্র দত্ত ও বিহারীলাল গুপ্ত মহাশয়গণের নাম উল্লেখযোগ্য। শিক্ষকগণের মধ্যে সংস্কৃত অধ্যাপক রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয়গণের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে।

গিরীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ পুত্র (প্রসিদ্ধ শিল্পী ডাক্তার অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পিতা) গুণেন্দ্রনাথ জ্যোতিবাবুর সমবয়সী ছিলেন। ইনি অত্যন্ত সঙ্গীতানুরাগী, বিদ্যোৎসাহী, উদারহৃদয় ও পরোপকারী ছিলেন। কলেজে পাঠাবস্থায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ পাঠে অবহেলা করিয়া গুণেন্দ্রনাথের বৈঠকখানায় অনেক সময় গানবাজনা ও গল্পগুজবে সময় অতিবাহিত করিতেন। কৈশোরে ইহাঁদের মাথায় নানা প্রকার কল্পনা আসিত এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সেগুলি কার্য্যে পরিণত করিতেন। সেকালের আদর্শে বসন্তোৎসব করা, পাশ্চাত্য আদর্শে ফ্রিমেসন সম্প্রদায় গঠন করা, জাতীয় পরিচ্ছদের সংস্কার সাধন প্রভৃতি কত প্রকার খেয়াল বহু অর্থব্যয়ে কার্য্যে পরিণত করিতেন তাহার ইয়ত্তা নাই। একবার কথা উঠে, বাঙ্গালা সাহিত্যে extravaganza নাট্য নাই। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ পুরাতন সংবাদপত্র 'প্রভাকর' হইতে কতকগুলি মজার কবিতা দিয়া এক অদ্ভুত নাট্য প্রস্তুত করেন এবং গুণেন্দ্রনাথের বৈঠকখানায় সেই অদ্ভুত নাট্যের মহলা আরম্ভ করিয়া দেন। তাহাতে একটি গান ছিল—

ও কথা আর ব'লোনা, আর ব'লোনা,
বলছো বঁধু কিসের ঝোঁকে—

ও বড় হাসির কথা, হাসির কথা,
হাসবে লোকে, হাসবে লোকে—
হাঃ হাঃ হাঃ হাসবে লোকে !—

হাঃ হাঃ হাঃ—এই যায়গাটায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ গানের সুর হাসির অনুকরণে রচনা করিয়া দিয়াছিলেন। বৈঠকখানায় অনেক সময়ে ঐরূপ 'হাঃ হাঃ হাঃ' সুরে এবং ধুপধাপ শব্দে প্রচণ্ড তাণ্ডব নৃত্য চলিত।

বিদ্যালয় ত্যাগ ও ফরাসী ভাষা শিক্ষা।

১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালীদিগের মধ্যে প্রথম সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ইংলণ্ডে ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পর বৎসর তিনি ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করেন এবং বোম্বাই প্রদেশে রাজকার্য্যে নিযুক্ত হন। তাঁহার বাল্যবন্ধু মনোমোহন ঘোষ দুইবার সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হন এবং ব্যারিষ্টার হইয়া ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে এদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। কলিকাতার উপকণ্ঠে কাশীপুরে এক উদ্যানবাটিকায় তিনি প্রথমে অবস্থান করেন। সত্যেন্দ্রনাথ কিছুদিনের জন্য সস্ত্রীক কলিকাতায় আসিয়া তাঁহার সহিত বাস করেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথও তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হইলেন। তিনি এফ্‌.এ পরীক্ষা প্রদানের ইচ্ছা পরিত্যাগ করিয়া মনোমোহনের নিকট ফরাসীভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন এবং সত্যেন্দ্রনাথের সহধর্ম্মিণী :মাননীয়া শ্রীযুক্তা জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর নিকট বোম্বায়ের গল্প শুনিয়া বোম্বাই দেখিবার জন্য উৎসুক হইলেন। চিরমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বন্ধু স্যর তারকনাথ পালিত তাঁহাকে এফ্‌.এ পরীক্ষা দিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিয়াছিলেন, কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁহার পরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়া সত্যেন্দ্রনাথ ও তদীয় সহধর্ম্মিণীর সহিত বোম্বায়ে যাত্রা করিলেন।

সঙ্গীত ও নাট্যকলার চর্চ্চা। বোম্বাইএ অবস্থানকালে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বহু ইংরাজী ও সংস্কৃত গ্রন্থ পাঠ করেন এবং একজন গুজরাটি মুসলমান কলাবিদের নিকট উত্তমরূপে সেতার বাদ্য শিক্ষা করেন। কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়া তিনি পিয়ানো বাজাইতেও শিখেন। বিষ্ণু চক্রবর্ত্তী নামক একজন নিপুণ গায়ক তখন ব্রাহ্মসমাজে গান করিতেন। ইঁহার নিকট হারমোনিয়ম ও সঙ্গীত পূর্ব্বেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ শিখিয়া লইয়াছিলেন। হারমোনিয়াম বাদক বলিয়া জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সুনাম হইয়াছিল। তিনি এই সময়ে ব্রাহ্মসমাজে বাঙ্গলা গানের সহিত হারমোনিয়াম বাজাইতে আরম্ভ করেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ ও হেমেন্দ্রনাথের সহযোগে তিনি এই সময়ে হিন্দী গান অবলম্বনে কতকগুলি উৎকৃষ্ট ব্রহ্মসঙ্গীতও রচনা করেন।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ও তাঁহার খুল্লতাতপুত্র গুণেন্দ্রনাথের সঙ্গীতের ন্যায় নাট্যকলায় গভীর অনুরাগ ছিল। কেশবচন্দ্র সেনের ভ্রাতা কৃষ্ণবিহারী, জ্যোতিবাবুর সহপাঠী ও বাল্যবন্ধু সুকবি অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী, গুণেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ভগিনীপতি যদুনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় মিলিয়া এই সময়ে একটি নাট্যসমিতি গঠিত করেন। এবং মধুসূদনের 'কৃষ্ণকুমারী' ও 'একেই কি বলে সভ্যতা'র অভিনয় করেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রথমোক্ত নাটকের অভিনয়ে কৃষ্ণকুমারীর জননীর ও শেষোক্ত নাটকের অভিনয়ে সার্জ্জনের ভূমিকা গ্রহণ করেন। এইরূপ অভিনয় করিতে করিতে বাঙ্গালা সাহিত্যে উৎকৃষ্ট অভিনয়যোগ্য নাটকের অভাবের প্রতি ইহাদের দৃষ্টি পতিত হয়।

'নবনাটক'। উৎকৃষ্ট নাটক লিখাইবার জন্য ইহাঁরা ব্যগ্র হইলেন। 'ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী'র তৎকালীন প্রধান শিক্ষক এবং ইহাঁদের ভূতপূর্ব্ব গৃহশিক্ষক ঈশ্বরচন্দ্র নন্দী মহাশয় পরামর্শ দিলেন, কৌলীন্য বিবাহ প্রভৃতি কতকগুলি সামাজিক বিষয় অবলম্বন করিয়া নাটক প্রণয়ন করান হউক। বিষয় স্থির হইবামাত্র সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইল যে উক্ত বিষয়ে সর্ব্বোৎকৃষ্ট নাটকের রচয়িতাকে দুইশত টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে। প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়গণ পরীক্ষক নিযুক্ত হইলেন।

উক্ত বিজ্ঞাপনানুসারে কয়েকখানি নাটক পাওয়া গেল, কিন্তু একখানিও পুরস্কারযোগ্য বিবেচিত হইল না। অতঃপর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রস্তাবে কোনও খ্যাতনামা নাট্যকারের উপর নাটক লিখিবার ভার অর্পণ করা স্থির হইল। তখন নাট্যকাররূপে রামনারায়ণ তর্করত্ন উচ্চ প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত 'কুলীন কুলসর্ব্বস্ব' ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে চড়কডাঙ্গায় জয়রাম বসাকের বাটীতে, 'বেণীসংহার' ঐ বৎসরে মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহের বাটীতে, 'রত্নাবলী' ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে পাইকপাড়া রাজবাটীতে এবং 'অভিজ্ঞানশকুন্তলা' ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে শাঁখারীটোলায় বাবু ক্ষেত্রমোহন ঘোষ মহাশয়ের বাটীতে মহাসমারোহে অভিনীত হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং তাঁহার উপরই সকলের দৃষ্টি পতিত হইল। গুণেন্দ্রনাথের অগ্রজ সাহিত্য-রসিক গণেন্দ্রনাথ বলিলেন, "থিয়েটার ছেলেখেলায় হয় না। থিয়েটার যদি করিতে হয় তবে সকলের সহিত পরামর্শ করিয়া ভাল করিয়া করাই উচিত।" তিনি পুরস্কারের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া ৫০০৲ পাঁচশত টাকা করিয়া দিলেন এবং নাট্যশালা সমিতি নূতন করিয়া গঠিত করিলেন।

এই নাট্যশালা সমিতির অনুরোধে রামনারায়ণ তর্করত্ন অল্প সময়ের মধ্যেই 'নব নাটক' নামক নূতন নাটক

প্রণয়ন করিলেন। ১২৭৩ সনের ২৩শে বৈশাখ এক প্রকাশ্য সভা আহূত হইল এবং কলিকাতার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের সমক্ষে নাটকখানি আদ্যোপান্ত পঠিত হইল। সভাপতি প্যারীচাঁদ মিত্র রৌপ্য পাত্রে রক্ষিত পাঁচশত টাকা তর্করত্ন মহাশয়কে প্রতিশ্রুত পুরস্কার বলিয়া প্রদান করিলেন। কেবল ইহাই নহে, গণেন্দ্রনাথ গ্রন্থখানির সহস্র খণ্ড মুদ্রণের সমস্ত ব্যয় এবং গ্রন্থ-স্বত্বও নাট্যকারকে প্রদান করিলেন।

অতঃপর অভিনয়ের বিরাট আয়োজন হইতে লাগিল। গুণেন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উৎসাহের সীমা ছিল না। উনবিংশতি-বর্ষ-বয়স্ক জ্যোতিরিন্দ্র কন্সার্টের হারমোনিয়মবাদকের ভার গ্রহণ করিলেন; অভিনয়েও নটীর ভূমিকা গ্রহণ করিলেন। নটীর মুখে একটি সুললিত সংস্কৃত গীত ছিল:—

মলয় নিলয় পরিহার পুরঃসর
সুর সমাগম নীরে,
বিকচ কমলকুল কলিকা পরিমল
বাহিনী বহতি সমীরে।
বহু পরিণায়ক নাথ বধূরব
সীদতি সপদি শরীরে
জলদতি বিরহ কৃশাঙ্গকৃশা কিল
মজ্জতি-লোচন নীরে॥

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে ৫ই জানুয়ারি (১২৭৩ সাল ২২শে পৌষ) যোড়াসাঁকোয় নবনাটক প্রথম অভিনীত হয়। কলিকাতার গণ্যমান্য সকল ব্যক্তিই অভিনয় স্থলে উপস্থিত ছিলেন এবং সকলেই একবাক্যে অভিনয়ের সুখ্যাতি করেন। দর্শকগণের আগ্রহাতিশয্যে ইহার পর উপর্যুপরি আটবার যোড়াসাঁকোয় নবনাটক অভিনীত হয়।

এই অনুষ্ঠানে আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মের চিরানন্দময় উপাসক মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথেরও আন্তরিক সহানুভূতি ছিল। তিনি ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে ১৬ই জানুয়ারি তারিখ সম্বলিত একখানি পত্রে কালীগ্রাম হইতে গণেন্দ্রনাথকে লিখিয়াছিলেন, "তোমাদের নাট্যশালার দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে— সমবেত বাদ্যদ্বারা অনেকের হৃদয় নৃত্য করিয়াছে— কবিত্বরসের আস্বাদনে অনেকে পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছে। নির্দ্দোষ আমোদ আমাদের দেশের যে একটি অভাব, তাহা এই প্রকারে ক্রমে ক্রমে দূরীভূত হইবে। পূর্ব্বে আমার সহৃদয় মধ্যমভায়ার উপরে ইহার জন্য আমার অনুরোধ ছিল, তুমি তাহা সম্পূর্ণ করিলে।"

নবনাটকের আখ্যানভাগে তাদৃশ বৈচিত্র্য ছিল না। স্ত্রীপুত্র সত্ত্বেও বৃদ্ধ বয়সে পুনরায় দারপরিগ্রহের বিষময় ফল প্রদর্শন করাই নাটকের উদ্দেশ্য ছিল। গবেশ নামক জনৈক জমিদার, স্ত্রী বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও পুনরায় বিবাহ করেন। নবপরিণীতা স্ত্রী চন্দ্রলেখার উৎপীড়নে প্রথমা পত্নীর গর্ভজাত পুত্র সুবোধ দেশত্যাগ করেন। ক্রমে বিষয় সম্পত্তি নষ্ট হইয়া যায়। প্রথমা স্ত্রী সাবিত্রী অশেষ যন্ত্রণা সহ্য করিয়া উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করেন। অবশেষে চন্দ্রলেখার প্রদত্ত বশীকরণ ঔষধ সেবনের ফলে গবেশ বাবু দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন।

এই নাটকের অভিনয় ও সজ্জাদি এরূপ সুন্দর হইয়াছিল যে গ্রন্থের যাহা কিছু দোষ ছিল তাহা কাহারও লক্ষ্যপথে আসে নাই। বলা বাহুল্য স্ত্রীগণের ভূমিকা পুরুষদিগের দ্বারাই অভিনীত হইয়াছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ভগিনীপতি যদুনাথ মুখোপাধ্যায়, সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় এবং নীলকমল মুখোপাধ্যায়, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের শ্যালক অমৃতলাল ও বিনোদলাল গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি এই নাটকের অভিনয়ে যোগদান করিয়াছিলেন। চিত্রপটগুলিও নিপুণ চিত্রকর দ্বারা অঙ্কিত হইয়াছিল। পঞ্চম দৃশ্যের চিত্রপট নানাবিধ লতা পাতা এবং জীবন্ত জোনাকী পোকা জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল। জোনাকী পোকা ধরিবার জন্য বহু লোক নিযুক্ত হইয়াছিল এবং এক একটী পোকার জন্য দুই আনা হিসাবে পারিশ্রমিক প্রদত্ত হইয়াছিল।

অভিনয় এরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছিল যে রামনারায়ণ তর্করত্ন মহাশয় মনের আনন্দে নাটকের প্রতিকূল সমালোচনাকারীদিগকে উদ্দেশ করিয়া বলেন,—"যারা প্লাট্ (plot) নাই প্লাট্ নাই বলে, এখানে এসে একবার দেখে যাক।"

প্রত্যক্ষদর্শী কিশোরীচাঁদ মিত্র 'কলিকাতা রিবিউ' পত্রে প্রকাশিত একটী প্রবন্ধের একস্থানে এই নাটক ও তাহার অভিনয় সম্বন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন:—

"The plot is poor and destitute of interesting incidents. * * * In truth, the acting was infinitely better than the writing of the play."

কৃষ্ণদাস পাল-সম্পাদিত 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রের সম্পাদকীয় স্তম্ভেও এই অভিনয়ের সুখ্যাতিপূর্ণ দীর্ঘ সমালোচনা প্রকাশিত হয়। আমরা উহা হইতে নটীর ভূমিকায় জ্যোতিরিন্দ্র নাথ কিরূপে দর্শকগণের দৃষ্টিতে প্রতিভাত হইয়াছিলেন তাহার পরিচয় দিতেছি:—

"The play opened with the usual appearance of not and notee with the customary prologue. Both were clad beautifully and Nattee particularly presented a very graceful figure. Her attiude, gestures, and

motions were as delicate as they were becoming though her singing we must confess was not up to the mark.!"

সঙ্গীত সম্বন্ধে সমালোচক যে মন্তব্য প্রকাশিত করিয়াছেন তাহার বিষয়ে আমরা এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, তৎকালে ব্রাহ্মসমাজে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সুগায়করূপে বিলক্ষণ খ্যাতি হইয়াছিল, বোধ হয় সংস্কৃত গীত বলিয়া সাধারণের তাদৃশ হৃদয়ঙ্গম হয় নাই। অবশ্য একথাও স্বীকার্য্য যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তরুণ বয়সে অত্যন্ত লাজুক ছিলেন। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে ১১ই এপ্রিল সত্যেন্দ্রনাথ গণেন্দ্রনাথকে আহমদাবাদ হইতে লিখিয়াছিলেন,—"I am afraid Jotee will feel rather lonely here. You know how shy he is by nature. So I cant get him to mix much with the Europeans or natives here. I suppose time alone will cure him." বৃদ্ধ বয়সে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন—"হাঁ, হেমদাদার সামনে অভিনয় করতে হবে মনে করে আমার যেন মাথা কাটা যাচ্ছিল।" তাঁহার শারীরিক গঠন ও সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে এই স্থানে শ্রদ্ধাস্পদ নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয়ের একটি স্মৃতি-কথার উল্লেখ করা যাইতে পারে। অমৃতলাল বলেন, যখন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কলেজে প্রথম বার্ষিকী শ্রেণীতে পড়েন, তখন অমৃতলাল হিন্দু স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীর ত্রয়োদশবর্ষবয়স্ক ছাত্র। এক একদিন গাড়ী আসিতে বিলম্ব হইলে ছুটির পর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ (তৎকালে গোলদীঘিতে অবস্থিত) ডেভিড হেয়ারের প্রস্তর মূর্ত্তির নীচে দণ্ডায়মান হইয়া গাড়ীর জন্য অপেক্ষা করিতেন। অমৃতলাল মুগ্ধ হইয়া অপলক দৃষ্টিতে তাঁহার তেজঃপূর্ণ পুরুষোচিত সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিতেন, সে অপরূপ সৌন্দর্য্য কোনও গ্রীক্ ভাস্করের আদর্শ হইতে পারিত। রহস্য করিয়া অমৃতলাল বলেন যে, 'তখন ত্রয়োদশ বর্ষীয় বালক ছিলাম তাহাই রক্ষা, নতুবা ত্রয়োদশ বর্ষীয়া বালিকা হইলে কি করিতাম বলা যায় না।'

নটীবেশে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ পরমা সুন্দরী যুবতীর ন্যায় প্রতিভাত হইয়াছিলেন। সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কর্ত্তৃক লিপিবদ্ধ 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতিতে' এই সম্বন্ধে একটা কৌতুকাবহ ঘটনার উল্লেখ আছে। সেই বিবরণটি নিম্নে উদ্ধৃত করিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিলাম না:—

"একদিনকার অভিনয়ে একটা বেশ কৌতুককর কাণ্ড ঘটিয়াছিল। জ্যোতিরিন্দ্র নটীর বেশ পরিয়াই, সাজ ঘরে কন্‌সার্টের সহিত হার্ম্মোনিয়ম বাজাইতেছিলেন। হাইকোর্টের তদানীন্তন বিচারপতি মাননীয় শ্রীযুক্ত সীটন কার সেদিন নিমন্ত্রিত হইয়া অভিনয় দর্শনে আসিয়াছিলেন। তিনি কনসার্ট শুনিবার জন্য, এবং কি কি যন্ত্রে কনসার্ট বাজিতেছে দেখিবার জন্য, কনসার্টের ঘরে ঢুকিয়াছিলেন। ঢুকিয়াই Beg your pardon, জেনানা, জেনানা" বলিয়াই অপ্রতিভ হইয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। পরে তাঁহাকে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছিল যে জেনানা কেহই ছিলেন না, যাঁহাকে দেখিয়াছিলেন, তিনি স্ত্রী-সাজে সজ্জিত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ।"

হিন্দুমেলা। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ আর একটি আন্দোলনে মাতিয়া গেলেন। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সহপাঠী, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের অর্থানুকূল্যে প্রচারিত 'ন্যাশন্যাল পেপার' নামক ইংরাজী সংবাদ পত্রের সম্পাদক, নবগোপাল মিত্র মহাশয়, স্বদেশপ্রেমিক রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের কল্পনানুসারে ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে চৈত্র মেলার (পরে হিন্দু মেলা নামে খ্যাত) অনুষ্ঠান করেন। এই মেলায় স্বদেশীয় শিল্প ও কৃষিজাত দ্রব্যাদি প্রদর্শিত হইত এবং জাতীয় সঙ্গীত এবং বক্তৃতাদি দ্বারা দেশপ্রেম উদ্দীপ্ত করিবার চেষ্টা করা হইত। গণেন্দ্রনাথের অর্থানুকূল্যে এবং উৎসাহেই এই প্রদর্শনী সাফল্য লাভ করিয়াছিল। গণেন্দ্রনাথ এই মেলায় গীত হইবার জন্য অনেকগুলি সুন্দর জাতীয় সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথের ভারত-সঙ্গীত—"মিলে সবে ভারত সন্তান, একতান মনপ্রাণ, গাও ভারতের যশোগান"—যে গান লক্ষ্য করিয়া 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রের ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিয়াছিলেন—"এই মহা সঙ্গীত ভারতের সর্ব্বত্র গীত হউক! হিমালয়ের কন্দরে কন্দরে প্রতিধ্বনিত হউক! গঙ্গা, যমুনা, সিন্ধু, নর্ম্মদা, গোদাবরী-তটে বৃক্ষে বৃক্ষে মর্ম্মরিত হউক! এই বিংশতি কোটি ভারতবাসীর হৃদয়-যন্ত্র ইহার সঙ্গে বাজিতে থাকুক!"—সেই গান এই মেলার জন্যই প্রথম রচিত হয়।

আচার্য্য শিবনাথ শাস্ত্রী, 'উদাসিনী'র কবি অক্ষয় চন্দ্র চৌধুরী প্রভৃতি এই মেলার জন্য জাতীয় ভাবের উদ্দীপক বহু কবিতা রচনা করিয়াছিলেন।

হিন্দু মেলার প্রতিষ্ঠার সময় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কলিকাতায় উপস্থিত ছিলেন না। তিনি তখন আহমদাবাদে সত্যেন্দ্রনাথের নিকট। গণেন্দ্রনাথকে লিখিত সত্যেন্দ্রনাথের নিম্নোদ্ধৃত ইংরাজি পত্রাংশের অনুবাদ পাঠে প্রতীত হয় যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তখন ফরাসীভাষা, চিত্রাঙ্কনবিদ্যা ও সেতার বাদন শিক্ষা করিতেছিলেন:—

১১-৫-৬৭—জ্যোতি আমার নিকট ফরাসী ভাষা শিক্ষা আরম্ভ করিয়াছে। আমি তাহার জন্য একজন ড্রয়িং মাষ্টারও নিযুক্ত করিয়া দিয়াছি, কিন্তু জ্যোতি পারিবে কিনা জানি না।

২-৬-৬৭—জ্যোতি সেতার শিক্ষা করিতেছে।

৪-৯-৬৭—জ্যোতি সেতার শিখিতেছে। ইহাই তাহার একমাত্র আমোদ। আমি তাহাকে ফরাসী শিখাইতেছি। সে খুব খাটিতেছে। বড় লাজুক—সমাজে মিশিতে পারে না। বোধ হয় বাড়ী যাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছে।

দ্বিতীয়বার হিন্দু মেলার অধিবেশনের পূর্ব্বেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন এবং নবগোপাল মিত্র মহাশয়ের অনুরোধে তিনি ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে দ্বিতীয় বাৎসরিক মেলায় পঠিত হইবার জন্য 'উদ্বোধন' নামক একটি কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বর ক্ষীণ বলিয়া হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বজ্র-গম্ভীর কণ্ঠে মেলায় তাহা পাঠ করিয়াছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ১৯।২০ বৎসর বয়সে রচিত এই সুদীর্ঘ কবিতাটির কিয়দংশ পাঠকগণের কৌতূহল পরিতৃপ্ত্যর্থে নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

"জাগ জাগ জাগ সবে ভারত সন্তান!
মাকে ভুলি কত কাল রহিবে শয়ান?
ভারতের পূর্ব্ব কীর্ত্তি করহ স্মরণ,
রবে আর কত কাল মুদিয়ে নয়ন?
দেখ দেখি জননীর দশা একবার,
রুগ্ন শীর্ণ কলেবর, অস্থি চর্ম্ম সার!
অধীনতা অজ্ঞানাদি রাক্ষস দুর্জ্জয়,
শুষিছে শোণিত তাঁর বিদরি হৃদয়!
স্বার্থপর অনৈক্য পিশাচ প্রচণ্ড,
সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর দেহ করে খণ্ড খণ্ড।
মায়ের যাতনা দেখি বল কোন্ প্রাণে
সুপুত্র থাকিতে পারে নিশ্চিন্ত মনে?
যে জননী পয়ঃসুধা শত নদী-ধারে,
পিয়াইছে নিরবধি আমা-সবাকারে;
যে জননী মৃদু হাসি' সব দুঃখ ভুলি'
উপাদেয় নানা অন্ন মুখে দেন তুলি';
এমন মায়েরে ভোলে যে-কোন সন্তান,
নিশ্চয় হৃদয় তার পাষাণ সমান।" *

সন্ধ্যায়।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

১১। তিনি আর আমি।

সূর্য্য অস্তাচলে ডুবিয়া গিয়াছে। সন্ধ্যার অন্ধকার নীরবে—অতি নিঃশব্দ পদক্ষেপে সমস্ত আকাশ জুড়িয়া নামিয়া আসিল। দেখিতে দেখিতে অন্ধকার চারিদিকে ঘিরিয়া আসিল। মাথার উপরে, দক্ষিণে বামে, পায়ের নীচে, সম্মুখে পশ্চাতে,—সকল দিকেই আমাকে অন্ধকারে ঘিরিয়া বসিয়াছে। এত অন্ধকার যে কখন্ নামিয়া আসিল, কখন্ যে চুপি চুপি আমাকে ঘিরিয়া ফেলিল, আমি তো তাহার বিন্দুবিসর্গও জানিতে পারি নাই। কোথাও একটী শব্দ নাই। পাখীরাও নিজের নিজের বাসায় নীরব হইয়া গিয়াছে। বটবৃক্ষও নীরব ধ্যানের যোগাসনে বসিয়া গিয়াছে। বাদুড় চামচিকা প্রভৃতি দু-একটী নিশাচর প্রাণী এদিকে ওদিকে নিঃশব্দে ঘুরিয়া ফিরিয়া সন্ধ্যার অন্ধকারকে আরও প্রগাঢ়তর করিয়া তুলিতেছে। আকাশের পানে তাকাইয়া দেখি—দু' একটী তারা ফুটফুট করিতেছে—আবার দুএকটী বা তারা বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। আকাশের দিকে চাহিয়াই আছি—চাহিয়াই আছি—মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্ত যে কোন্ দিক্ দিয়া চলিয়া গেল, জানিতেও পারিলাম না। ক্রমে হৃৎস্পন্দন থামিয়া গেল—চিত্তবৃত্তিই নিরুদ্ধ হইয়া আসিল। তখন আর নিজেরও সঙ্গে নিজের কথা চলিল না। সমস্তই নীরব—বাহিরেও নীরব, অন্তরেও নীরব—নীরবে নীরব—কেবল তিনি আর আমি—আমি আর তিনি। কথা নাই—কথা নাই—তাঁহাতে-আমাতে কেবলই চোখোচোখি—কেবলই ছোঁয়াছুঁয়ি। Alone to the Alone! তিনি আর আমি—আমি আর তিনি।

১২। স্বপ্ন বা প্রত্যক্ষ।

মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্ত চলিয়া গেল—কতটা কাল যে এইভাবে চলিয়া গেল, কিছুই জানিতে পারি নাই। কোথায় বা ছিলাম—কি-ই বা দেখিলাম—সমস্ত বুঝিতেও পারি নাই—কিছুই বলিতেও পারি না। তবে কি স্বপ্নই দেখিতেছিলাম? যদি বা স্বপ্নই দেখিয়া থাকি, তবে সে রকম স্বপ্ন দেখাও আমার সৌভাগ্য। কি-ই সেই আনন্দ-মূর্ত্তি—কি-ই বা সেই অপরূপ জ্যোতি! কিছুই জানি না—কিছুই বুঝি না। কিন্তু কে যেন আমাকে নীরব অনাহত শব্দে বলিয়া গেল—যাঁহার দয়াতে জননীর গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়া চক্ষু খুলিতে পারিয়াছ; যাঁহার কৃপায় এই বিশ্বজগতের আশ্চর্য্য মহিমা

---

* 'মানসী ও মর্ম্মবাণী'—১৩৩২ জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যা হইতে উদ্ধৃত।

দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া যাও—ইনি যে সেই জননীর জননী—মহাজননী। সেই মহাজননীর যে অরূপ রূপের জ্যোতি দেখিলাম, তাহা কতই স্নিগ্ধ—কতই মধুর! সেই জ্যোতিতে চক্ষু ঝলসিয়া যায় না। সেই জ্যোতির কি-এক আকর্ষণী শক্তি আছে—যতই দেখি, মনে হয় আরও দেখি, আরও দেখি। তাঁহার সেই জ্যোতির্ম্ময় রূপ দেখিতে দেখিতে—কোথায়—কোন্ সাগরে যে ডুবিয়া গেলাম, তাহা কিছুই বুঝিলাম না। মনে হইল—মুখে কথা নাই—মনে কথা নাই—মনে হইল, কেবল, অনিমেষ নয়নে তাঁহারই দিকে দৃষ্টি রাখিয়া তাঁহারই পার্শ্বে বসিয়া আছি। মনে হইল—আমি যেন এক নবজাত শিশুর আকারে সেই জননীর কোলে শুইয়া একমনে তাঁহার প্রেমপূর্ণ মুখখানি দেখিতেছি; আমার ছোট-ছোট হাত-পা খুবই নাড়িতেছি, আর তাঁহার স্পর্শ লাভ করিয়া এক অপার আনন্দ উপভোগ করিতেছি। তিনিও আমাকে সেই যে তাঁহার স্নেহময় আলিঙ্গনে বাঁধিয়া রাখিলেন—এক মুহূর্ত্তও—মুহূর্ত্তের এতটুকু অংশও—তিনি আমাকে ছাড়েন নাই। ইহা স্বপ্নই হোক, অথবা সমাধির প্রত্যক্ষ অনুভবই হোক—আমার বিচার করিবার কোন প্রয়োজন নাই, অবসর নাই। স্বপ্ন হইলে এই স্বপ্নের উপর দিয়া, আর প্রত্যক্ষ অনুভব হইলে এই প্রত্যক্ষ অনুভবের উপর দিয়াই যেন আমার জন্ম জন্ম কাটিয়া যায়।

১৩। অন্তঃপুরে।

সমাধি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। বাহিরে চক্ষু খুলিয়া দেখি—সেই সন্ধ্যারই অন্ধকার আমাকে ঘিরিয়া আছে। ওরে আমার মন! সূর্য্যকিরণের সঙ্গে সাগর ঢেউয়ের ঝিকিমিকি খেলা দেখা তো তোমার শেষ হইয়া গিয়াছে; আলোর সঙ্গে ছায়ার লুকোচুরি খেলা দেখা তো তোমার শেষ হইয়া গিয়াছে—তবে আর এখানে এখন বসিয়া কি হইবে? দিগন্তপ্রসারিত অন্ধকারের দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া চাহিয়া এমন মধুর সন্ধ্যাবেলা কাটাইলে কি হইবে? চল—এখন অন্তঃপুরে চল, ঘরের ভিতরে চল। অনেকটা সময় চলিয়া গিয়াছে বটে, তবু চল—অন্তঃপুরে সন্ধ্যাদীপ জ্বালিবে চল; চল, সেখানে মঙ্গলশঙ্খ বাজাইবে চল। সন্ধ্যামালিক ফুল লও; ভক্তিতুলসী হাতে লও; প্রেমের চন্দন আর শ্রদ্ধার ধুপ লইয়া চল—প্রাণের ভিতর জগজ্জনীর আরতি লাগাইয়া দাও। মলয়পবন জগজ্জননীকে চামর ব্যজন করিতে আরম্ভ করিয়াছে; মহাসাগর তাহার ঢেউয়ের আঙ্গুল দিয়া তাঁহার চরণ ধুইয়া দিতেছে। চল, জগজ্জননী হইতে আর দূরে থাকিও না। না—না তাঁহার আর আমার মাঝখানে কোন বাধা রাখিব না; অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ—এই তিন কালের মধ্যে কোন ভেদ, কোন বাধা থাকিতে দিব না।

১৪। নিন্দা ও প্রশংসা।

প্রাণারামের সঙ্গে—জগজ্জননীর সঙ্গে যখন এইভাবে দেখাদেখি ছোঁয়াছুঁয়ি চলে, লোকে বলে, তুমি আলস্যে কাল কাটাইতেছ! যাহার যাহা ইচ্ছা সে তাহা বলুক—তুমি তাহার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করিও না। তুমি হাতের উপর হাত রাখিয়া আকাশ দেখ, তারা দেখ, চাঁদ দেখ, আর সাগর ঢেউয়ের খেলা দেখ; মধ্যে মধ্যে অন্তঃপুরে গিয়া জগজ্জননীর চরণপূজা করিয়া এসো—যাহার যাহা বলিতে ইচ্ছা, সে তাহা বলুক। এই জগতে আলো-ছায়ারই খেলা চলিতেছে—আলো আর ছায়া আলোরই এপিঠ আর ওপিঠ। নিন্দা আর প্রশংসাও একই জিনিসের এপিঠ আর ওপিঠ—তখন নিন্দা আর প্রশংসা লইয়া আমার মাথা ব্যথা করিবার কিছুই নাই। প্রশংসা আমাকে বাহিরে লইয়া যায়—ভগবানের হস্তের কারু-কৌশল দেখাইতে লইয়া যায়। নিন্দা প্রহরীস্বরূপে দাঁড়াইয়া আমাকে অন্তঃপুরে পাঠাইয়া দেয়—সেখানে জগজ্জননীকে প্রত্যক্ষ দেখিয়া তাঁহার চরণপূজা করিয়া কৃতার্থ হই। কোন্‌টা ভাল—নিন্দা না প্রশংসা? যে যাহা বলিতে চাহে, বলিতে দাও—নিন্দাতেও তোমার ক্ষতি হইবে না, বরঞ্চ লাভই হইবে; প্রশংসাতেও তোমার বিশেষ ক্ষতি দেখি না—তুমি যে প্রশংসার স্বরূপ জানিয়াছ!

১৫। জগজ্জননীর আরতি।

সমুদ্রের পরপার হইতে চাঁদ উঠিতেছে। চন্দ্রমা স্বহস্তে তাঁহার মহাপ্রদীপ জ্বালাইয়া আজ জগজ্জননীর আরতিতে যোগ দিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছেন দেখিতেছি। চন্দ্রমার সঙ্গে মলয় পবন ও সমুদ্রের বড়ই সদ্ভাব ও সম্প্রীতি আছে বলিয়া মনে হয়। তাই চাঁদ উঠিতে না উঠিতেই মলয়পবনও চন্দ্রমার সঙ্গে জগজ্জননীর আরতিতে যোগ দিবার জন্য চামর ধারণ করিয়া উপস্থিত! মহাসাগরও উহাদের দেখাদেখি আরতিক্ষেত্রে অগ্রসর হইবার জন্য লালায়িত—তাই তাহারও প্রাণে আনন্দের ঢেউ দেখা দিয়াছে। মহাসাগর তুরী ভেরী প্রভৃতি নানাবিধ বাদ্য একসঙ্গে বাজাইতে আরম্ভ করিয়াছে। জয় মা জগজ্জননী—তোমার আরতি আজ যেন আমরা সকলে মিলিয়া সুসম্পন্ন করিতে পারি।

১৬। সাগরে-চাঁদে খেলা।

চাঁদের সঙ্গে মহাসাগরের যেন একটু বেশী ঘনিষ্ঠভাব আছে দেখি। তাই চাঁদ উঠিতে এমন শান্ত মহাসাগরেও আনন্দের তরঙ্গ উছলিত হইয়া উঠিতেছে। আবার চাঁদও নিজের সমস্ত হৃদয়খানি মহাসাগরের উদার প্রশস্ত বক্ষের

উপর ঢালিয়া দিয়া একেবারে আহ্লাদে আটখানা—কুটিকুটি হইয়া আনন্দের হাসি হাসিতেছে। মহাসাগরের সঙ্গে চাঁদের খেলাটা একবার দেখ! খেলা চলিতেছে—কে কাহাকে ধরিবে? কেহই কাহাকেও ধরিতে পারিতেছে না—ধরিতে পারিলেও ধরিয়া রাখিতে পারিতেছে না। হায়-হায়! কোথায় গেল আমার সেই শান্ত নীরব ভাব? আমিও উহাদের খেলা দেখিতে দেখিতে তন্ময় হইয়া গিয়াছি—মনে প্রাণে উহাদেরই সঙ্গে খেলিতে লাগিয়া গিয়াছি। ওরে মন! খেল—খেল—এই বেলা যাহা কিছু খেলিবার আছে, খেলিয়া লও। এ জগতের খেলাই এইরূপ—সকলেই সকলকে ধরিতে চাহে—সকলকেই সকলেই ধরিব ধরিব করিয়া আগাইয়া যায় বটে, কিন্তু—কেহই কাহাকেও ধরিয়া রাখিতে পারে না।

১৭। প্রাণের কথা।

মা—জননী আমার—পিতা আমার—কবে সমস্ত সংসার ছাড়িয়া দিয়া তোমার চরণতলে বসিয়া থাকিবার অধিকার পাইব? পিতা আমার—জননী আমার—তুমি তো আমার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ দেখিতেছ—বল পিতা—বল—কবে আমি সেই অধিকার লাভ করিব? কবে এই মহা কালপারাবারের বাধা ছিন্ন করিয়া কালের অতীত মহাকাল তোমাকে আমার হৃদয়ে নিত্যকাল প্রেমের অচ্ছেদ্য তন্তু দ্বারা বাঁধিয়া রাখিতে পারিব? আর না—দর্শনের ভেদাভেদ লইয়া তর্কবিচার আর শুনিতে পারি না—আমি চাই প্রেমের প্রস্ফুটিত শতদল—ফুটন্ত গোলাপ—গন্ধে গন্ধে দিকসকল আমোদিত করিয়া তুলিতে চাই; প্রেমের অদৃশ্য সূত্রে আমি স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল এবং অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ বাঁধিতে চাহি, আর জগজ্জননীর সঙ্গে তাঁহার এই ক্ষুদ্র সন্তানকে অটুট বাঁধনে বাঁধিতে চাহি। এই কুসুমকোমল প্রেমের বজ্রকঠোর বলে মৃত্যুর মরণ হউক।

ওঁ মণি পদ্মে হুং।

(শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়)

"ওঁ মণি পদ্মে হুং" এই মন্ত্র তিব্বতীয় বৌদ্ধগণ জপ করিয়া থাকেন। ইহার পরিচয় আমরা বহুপূর্ব্বে পত্রিকাতে প্রদান করিয়াছি। এই ষড়ক্ষরী বিদ্যা বা মন্ত্র, কেবল যে তিব্বতীয়গণ জপ করে, তাহা নহে—মঙ্গোলীয়গণও ব্যবহার করিয়া থাকে। তাহারা যে কেবলমাত্র মুখে উচ্চারণ করে তাহা নহে তাহাদের প্রার্থনাচক্র আছে। চক্রের দণ্ড পর্ব্বতচূড়ায় প্রোথিত থাকে এবং ঐ চক্র ঘুরাইয়া দিলে অনবরত ঘুরিতে থাকে, তাহাতে জপের কার্য্য সংসাধিত হয়। অনেক ভক্ত আবার হস্তে চক্র লইয়া বিচরণ করেন। মুখে মন্ত্র-জপ না করিয়া চক্র ঘুরাইতে পারিলেও জপের ফল হয়। এই মন্ত্র অশেষ ফলপ্রদ এবং সর্ব্বার্থ সিদ্ধিদায়ক ইহাই উহাদের ধারণা। এই মন্ত্র তাহাদের ধর্ম্মের সার, এবং এই মন্ত্রজপই নির্ব্বাণলাভের একমাত্র পথ। এই মন্ত্রজপই পরজন্মে উন্নততর যোনি লাভ করিবার উপায়, এই মন্ত্রজপই অন্ধকারের মধ্যে আলোক আগমনের পথ। এই মন্ত্রের প্রকৃত অর্থ অবধারণ করিবার জন্য অনেকে গবেষণা করিয়াছেন। কিন্তু উহার তাৎপর্য্য কি তাহা অবিসংবাদীরূপে নিরূপিত হয় নাই। বেহার উড়িষ্যা জার্ণেলের ১৯২৫ সালের মার্চ্চ সংখ্যায় ষ্টেন-কোনো সাহেব এই মন্ত্র লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন যে এই মন্ত্র বৌদ্ধধর্ম্মের সঙ্গে বিজড়িত হইলেও ইহার উৎপত্তি শৈবধর্ম্ম হইতে এইরূপ ধারণা করিবার কারণ আছে। পালি ত্রিপিটকের মধ্যে ইহার বিশেষ সন্ধান মিলে না; হীনযান বৌদ্ধধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যেও নহে, কিন্তু মহাযানসম্প্রদায়ের মধ্যে এই মন্ত্রের পরিচয় মিলে। হীনযান বৌদ্ধগণের মতে প্রত্যেককে জ্ঞানের বিকাশ সাধন করিতে হইবে, বিশ্বাসী হইতে হইবে, সাধনা করিতে হইবে, বুদ্ধদেবের প্রচারিত সত্যের আলোক ধরিয়া চলিতে হইবে; অপরে তোমার মুক্তি আনিয়া দিবে না। সাধন করিতে করিতে আনন্দ লাভ হইবে, এবং ইহা হইতে পরিশেষে তোমারই নির্ব্বাণ-লাভ ঘটিবে।

বুদ্ধদেব যখন সাধারণ লোকের মধ্যে ধর্ম্মপ্রচার করিতেন, তখন তাহাদের নিকটে গভীর তত্ত্বের বা সত্যের বড় পরিচয় দিতেন না; কেবল দৈনিক কর্ত্তব্য,দানের আবশ্যকতা ও নীতিমার্গানুযায়ী হইবার উপদেশ দিতেন। স্বর্গে তাহাদের জন্য যে আনন্দ সঞ্চিত রহিয়াছে তাহারই আভাস দিতেন। তাহাদের নিকট তিনি পথপ্রদর্শকমাত্র ছিলেন। উপাসক ও উপাসিকাগণ তাঁহার নিকট এইমাত্র সাহস পাইত, যে, পরজন্মে তাহারা উন্নততর যোনি প্রাপ্ত হইবে।

মহাযানসম্প্রদায়ের ভিতরে বুদ্ধদেবের উপদেশ ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছিল। মহাযানের কোন কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যক্তিগত সাধন ও ধ্যানের ভাব প্রগাঢ় হইয়া উঠিয়াছিল। মহাযান-সম্প্রদায়ী বৌদ্ধগণ মনে করেন যে তাঁহাদের ধর্ম্ম এক সময়ে জগতের শ্রেষ্ঠতম ধর্ম্ম হইয়া দাঁড়াইবে।

অনেক বোধিসত্ত্ব আবির্ভূত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে কেহই অবলোকিতেশ্বর অপেক্ষা উচ্চতর স্থান অধিকার করিতে পারেন নাই। অবলোকিত+ঈশ্বর এই দুইটি শব্দের সমষ্টিতে অবলোকিতেশ্বর শব্দের উৎপত্তি; ঈশ্বর শব্দের অর্থ সমর্থ। যিনি সমধিক পরিমাণে আত্মদৃষ্টি লাভ করিতে পারিয়াছেন, তিনিই অবলোকিতেশ্বর। তিনিই সাধু মনুষ্যকে "সুখাবতীতে" (স্বর্গে) লইয়া যান। সুখাবতী শব্দের অর্থ স্বর্গ, যেখানে অমিতাভ রাজত্ব করেন। অমিতাভ শব্দের অর্থ অসীম আলোক। তিনিই "ওঁ মণি পদ্মে হুং" এই মন্ত্রের প্রচারক।

মহাযানগণের মধ্যে সত্যসত্যই বুদ্ধদেবের শিক্ষা বিপুলতা ও সমুন্নতি লাভ করিয়াছিল এবং ভারত-বর্ষের সাধনার ভাব নব উন্মেষ প্রাপ্ত হইয়াছিল। অন্য কথায় এই ব্যক্তিগত সাধনার দ্বারা উন্নতি-লাভের প্রচেষ্টা—যাহা মহাযানদিগের প্রাণের কথা, উহার প্রতিধ্বনির পরিচয় হিন্দুর নানা সম্প্রদায়ের মধ্যে যথেষ্ট প্রাপ্ত হওয়া যায়। এইরূপ অবস্থায় মনে করা যাইতে পারে "ওঁ মণি পদ্মে হুং" এই মন্ত্র বৌদ্ধধর্ম্মের বাহিরের—প্রাচীন হিন্দুধর্ম্ম হইতে আসিয়াছে।

অবলোকিতেশ্বরের নিকট এই ষড়ক্ষরী মন্ত্র প্রথম প্রকাশ পাইয়াছিল এইরূপ প্রবাদ আছে; কিন্তু তিব্বতীয়গণের মধ্যে উহার কোন প্রচলন নাই। মহাযানদিগের সংস্কৃত-গ্রন্থ কারণ্ডব্যূহের ভিতরে ইহার উল্লেখ দেখা যায়। দিব্যাবদান গ্রন্থে ঠিক এই মন্ত্রের অনুরূপ পাওয়া যায় না। কারণ্ডব্যূহ ২৭০ খৃষ্টাব্দে চীনভাষায় অনুবাদিত হয়, আজকাল এদেশে যে কারণ্ডব্যূহ গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা চীন-অনুবাদ হইতে অনেক স্থলে বিভিন্ন।

বোধিসত্ত্ব সর্ব্বনিবারণবিস্কম্ভী বুদ্ধদেবকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—কোথা হইতে এই ষড়ক্ষরী বিদ্যা লাভ করা যাইতে পারে? বুদ্ধদেব বলিতেছেন যে বুদ্ধ পদ্মোত্তর, অবলোকিতেশ্বরের নিকট ইহা প্রাপ্ত হন এবং তাঁহার নিকট হইতে বুদ্ধদেব নিজে উহা লাভ করেন। অমিতাভ বলিয়াছিলেন যে মণ্ডল জানিতে না পারিলে এই মন্ত্রের প্রকৃত শিক্ষা হইতে পারে না। ঐ মণ্ডল সমচতুর্ভুজাকৃতি, প্রতি ভুজের পরিমাণ চারি হাত। উহার ঠিক মধ্য-স্থলে অমিতাভ, তাঁহার দক্ষিণে বোধিসত্ত্ব মহামণিধর এবং বামে উক্ত ষড়ক্ষরী মন্ত্র। ঐ ষড়ক্ষরী মহাবিদ্যা চতুর্হস্তযুক্তা স্ত্রীরূপিণী, শরৎকালের চন্দ্রের ন্যায় তিনি শুক্লবর্ণা; বামহস্তে তিনি রক্তকমল বা পদ্ম ধারণ করিয়া আছেন এবং দক্ষিণ হস্তে জপের মালা রহিয়াছে। অন্য দুই হস্ত বিশেষ বিশেষ মুদ্রাযুক্ত। ঐ ষড়ক্ষরী মন্ত্রকে দেবতা অর্থাৎ অনাদি শক্তির বিকাশ এই আখ্যা প্রদান করা হয়। শাস্ত্রের মত যে, এই ভিন্ন ভিন্ন শক্তির স্বতন্ত্র জীবন আছে, জীবের ন্যায় স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে। বৈদিক দেবতাগুলিও বিভিন্ন শক্তির পরিচায়ক এবং বিভিন্ন গুহ্য শক্তির প্রকাশক, এবং এই মূর্ত্তিরূপে এই বিভিন্ন শক্তি সহজে পূজিত হইতে পারে। শক্তির এইরূপ মূর্ত্তিদান বা মূর্ত্তিকল্পনা, প্রাচীন আর্য্যজাতির একভাবে কতকটা বিশেষত্ব বলা যাইতে পারে। ষড়ক্ষরী বিদ্যার ৬টি অক্ষরের মধ্যে যে শক্তি প্রচ্ছন্ন, তাহা মনুষ্যমূর্ত্তিতেই বল আর অতি-মনুষ্যমূর্ত্তিতে বল এই ষড়ক্ষরী মন্ত্র স্ত্রীরূপে অঙ্কিত—কেন না বিদ্যা স্ত্রীলিঙ্গ।

এক্ষণে ঐ মন্ত্রের মণ্ডল—যাহা পূর্ব্বোক্ত রূপে চিত্রিত হয়, তাহা হইতে বুঝিতে হইবে যে রক্ত-পদ্ম এবং জপমালা এই দুইটিই ঐ মণ্ডলের বা মূর্ত্তির বিশেষত্ব এবং উহাই প্রজ্ঞাপারমিতার দ্যোতক; এবং ষড়ক্ষরী মন্ত্রই ঐ দেবতাকে প্রকাশ করে। কারণ্ডব্যূহ পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে ঐ মন্ত্রই প্রজ্ঞাপারমিতা। পরে বলা হইয়াছে যে প্রজ্ঞাপারমিতাই সকল বুদ্ধের জননী।

এই প্রজ্ঞাপারমিতা অর্থাৎ পরিশুদ্ধ জ্ঞান ও আলোক-লাভই বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রাণ। বুদ্ধ-গণকে দান ও শীলাদি দ্বারা সম্যক উন্নতি বা

পারমিতা বা সিদ্ধি লাভ করিতে হইবে। এই সমস্ত সিদ্ধি যে কেবল মাত্র বুদ্ধের ব্যক্তিগত ও অবিচ্ছিন্ন ভাব, তাহা নহে; কিন্তু এই সমস্ত ভাবের বা সিদ্ধির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব, স্বতন্ত্র জীবন, ও স্বতন্ত্র শক্তি আছে; এবং কালে যখন ঐ সমস্ত বিভিন্ন শক্তি সংমিলিত হয়, তখনই এক-একটি বুদ্ধের জন্ম হয়, ইহাই বৌদ্ধগণের ধারণা। বৈদিক সময়েও এইরূপ শক্তির যে দেহ আছে তাহার পরিচয় মিলে। উহা বৈদিক সাহিত্যে তনু বলিয়া কথিত। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি এই ধারণা হইতেই বৈদিক দেবতাগুলি সমুদ্ভূত। বৈদিক দেবতাগুলি কোন মনুষ্যবিশেষের মূর্ত্তি নহে—কিন্তু শক্তির মূর্ত্তি। প্রজ্ঞাপারমিতা স্ত্রীমূর্ত্তিতে অঙ্কিত এবং তিনিই সমস্ত বুদ্ধের জননী। মাতৃমূর্ত্তিতে আবার তিনি কথন পরিচিত—চিহ্নিত। আদি-জননী বলিয়া তাঁহার উল্লেখ আছে।

প্রকৃত পক্ষে বৌদ্ধগণই জ্ঞানমার্গকে আশ্রয় করিয়াছিল। সম্যক্ জ্ঞানলাভ ও নির্ব্বাণলাভই তাহাদের উদ্দেশ্য। বোধিবৃক্ষের তলদেশে বসিয়া বুদ্ধদেব এই সত্যের উন্মেষ প্রাপ্ত হন। প্রত্যেক বুদ্ধকে এই জ্ঞান অর্জ্জন করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। এই সম্যক জ্ঞান-লাভই বুদ্ধকে বিগঠিত করিয়া তুলিয়াছিল। এই সম্যক জ্ঞানলাভেই সাধারণ মনুষ্য বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে।

খৃষ্টের জননী মেরীর যে প্রতিমূর্ত্তি দেখা যায়, তাহা খৃষ্টের মাতারই প্রতিমূর্ত্তি। কিন্তু আর্য্যজাতির প্রাচীন যুগে যে মূর্ত্তির পরিচয় পাই, তাহা কোন নরনারীবিশেষের মূর্ত্তি নহে, কিন্তু তাহা শক্তি-বিশেষের প্রতিচ্ছবি।

প্রজ্ঞাপারমিতা বুদ্ধমাত্রেরই জননী কেন—তিনিই আদি জননী। এই আদি জননীর ভাব আর্য্যজাতির মধ্যে বহু পুরাতন। ইহা জীবন্ত শক্তি, যেখানে যাহা কিছু প্রসূত হইয়াছে সবই তাঁহা হইতে। ক্রমে তাঁহাদের ভিতরে আদি পিতার ভাব জাগিয়া উঠিল। কেবল মাতা হইতে সৃষ্টি হইতে পারে না, পিতাও চাই। তাই আমরা "পৃথ্বী মাতা" ও "দ্যৌঃ পিতা" এইরূপ পরিচয় ঋগ্বেদের ভিতরে দেখি। মাতার ভাব পৃথিবীতে, পিতার ভাব আকাশে। এই আকাশ জলধারা বর্ষণে পৃথিবীকে শস্যপ্রসবিনী করিতেছেন। প্রকৃত পক্ষে সাধারণ ভাবে দেবতা বলিলে যাহা বুঝা যায়, তাঁহারা তাহা নহেন; কিন্তু সৃষ্টির ভিতরে যে অলক্ষ্য শক্তি কার্য্য করিতেছে তাঁহারা উহাই। সৃষ্টির ভিতরে পুরুষ-শক্তি ও স্ত্রীশক্তি এই উভয়-বিধ শক্তি কার্য্য করে, ইহাই আমরা সচরাচর দেখিতে পাই; তাই আদিকালে শক্তিমান ও শক্তির কল্পনা বেদের ভিতরেও দেখিতে পাই।

এই শক্তির ভাব পরবর্ত্তী সময়ে শৈবধর্ম্মের ভিতরে এবং বৌদ্ধ-যুগে তন্ত্রের ভিতরে সমধিক পরিমাণে বিকশিত হইয়া উঠে। ক্রমে এই ভাব ফুটিয়া উঠে যে ঈশ্বর এক এবং অনাদি, তাঁহার কোন কামনা বা অভাব নাই; এবং বিকশিত হই-বার জন্য তাঁহার কোন লালসাও নাই। অথচ সর্ব্ববিধ প্রভাব ও তেজ তাঁহার অন্তর্ভূত। কিন্তু তাঁহার এই যে তেজ, এই যে সামর্থ্য, এই যে বল, ইহা তাঁহার শক্তির ভিতর দিয়া বিকশিত।

ক্রমে কর্ম্মবাদ অর্থাৎ সমস্তই কর্ম্মাধীন এই মত প্রাচীন ভারতে দেখা দিল। উপনিষদের ভিতরেও এই "কর্ম্মবাদের" পরিচয় মিলে। এই কর্ম্মই মনুষ্যের অদৃষ্টকে বিগঠিত করে, এই কর্ম্ম অনাদি, দুরতিক্রম্য তাহার প্রভাব। এই কর্ম্মবাদ ক্রমে ভগবানকে আসিয়া স্পর্শ করিল। স্থির ও গম্ভীর ভাবে তিনি বিরাজিত। এই কর্ম্মবাদ তাঁহাতে চাঞ্চল্য আনয়ন করিল। কর্ম্মাধীন হইয়া তিনি সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার শক্তিই এই প্রকৃতি, যাহার ভিতরে বিভিন্ন জীব জন্ম পরিগ্রহ করিতেছে। কিন্তু এই পরিদৃশ্যমান বিকাশের পশ্চাতে পরমেশ্বর বিরাজমান, প্রকৃত সত্তা কেবলমাত্র তাঁহাতে, এবং তাঁহাতেই আবার সব বিলীন হইয়া যাইবে। প্রকৃতি—এই বিকাশ; নির্বৃত্তি—পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তন।

এই কর্ম্মবাদ বৌদ্ধধর্ম্মের ভিতরে প্রবেশাধিকার লাভ করিয়াছিল। বুদ্ধগণ শক্তিপ্রভাবে অথবা শক্তি বা প্রজ্ঞাপারমিতা হইতে জন্মগ্রহণ করেন। প্রবৃত্তির সম্মুখে আসিয়া পড়েন। কর্ম্মের প্রভাবে যাহারা নানাবিধ কামনা ও তৃষ্ণার পশ্চাতে ধাবিত সেই সব মনুষ্যের উদ্ধারের চেষ্টা করেন। কামনা ও তৃষ্ণা হইতে সার সত্যের দিকে তাহাদিগকে

আকৃষ্ট করেন ; যেখানে যাইলে আর জন্ম হয় না, বুদ্ধি বিনাশ বা নির্য্যাতন সহ্য করিতে হয় না, সেই নির্ব্বাণের পথ দেখাইয়া দেন। তাঁহারা যে শক্তি লইয়া আবির্ভূত হন তাহা সেই একই মহাশক্তির বিকাশ, যে শক্তির নাম প্রজ্ঞা বা প্রজ্ঞাপারমিতা —যিনি বুদ্ধের জননী। এক্ষণে তিনি তাহার প্রভু হইয়া দাঁড়ান।

তাই আমরা অনেক মূর্ত্তিতে দেখিতে পাই যে, বুদ্ধদেব বা বোধিসত্ত্ব শক্তিকে আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছেন। তাই আমরা শৈবধর্ম্মের ভিতরে ও বৌদ্ধধর্ম্মের ভিতরে দক্ষিণাচার ও বামাচার দেখিতে পাই। দক্ষিণাচারে শক্তির সঙ্গে বুদ্ধদেবের আধ্যাত্মিক মিলন ; আর বামাচার হইতেছে সত্য সত্য কোন স্ত্রীলোকের সহিত অনুষ্ঠানসহকারে তান্ত্রিক সাধকের মিলন।

এই আধ্যাত্মিক মিলনের পক্ষে ছবি বা মূর্ত্তি সহায় হইতে পারে। বাচিক মন্ত্র, যাহা ছবি ও মূর্ত্তির আর একটি দিক, তাহার অবলম্বনেও এই এই আধ্যাত্মিক মিলন সুগম হইতে পারে। এই যে ছবি বা মূর্ত্তিকে আধ্যাত্মিক দিকে সত্য সত্যই অনুভব করিয়া লইতে হইবে, তাহার প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে। জপের এই মন্ত্রকে "ধরণী" বলা হয়। এই জপের মন্ত্র কখন বা দীর্ঘ কখনও হ্রস্ব। প্রতি মন্ত্রের আদিতে ওঁ শব্দ আছে। ওঁ শব্দ শক্তির পরিচায়ক। ওঁ শব্দের ভিতরে শক্তি নিহিত, তাহা (ধরণীর—ধৃ) ধারণ করিবার শক্তি জাগ্রত করে। তাহার পর বীজ—অর্থাৎ উপাদ্য দেবতার নাম ; ঐ বীজ নিতান্ত সংক্ষিপ্ত। ইন্দ্র দেবতার স্থানে "ইং" বলিলেই যথেষ্ট হইল। গণেশ দেবতার স্থানে "গ" বলিলেই হইল। এক ভাবে বলিতে গেলে ক্লীং, শ্রীং, হ্রীং, হুং, খট্, ফট্ প্রভৃতি অর্থহীন শব্দ মাত্র। এই সমস্ত বীজের উদ্দেশ্য "ধরণীর" সহিত সেই অবিনাশী শক্তির মিলন।

এই ষড়ক্ষরী মন্ত্রও এবম্প্রকারের "ধরণী"। উহার প্রথমে ওঁ আছে। অবিনাশী পুরুষের বা শক্তির সহিত মিলনলাভই এই শব্দের উদ্দেশ্য বা উহার সহায়। ওঁ এখানে বীজ নহে, বীজ হইতেছে "হুং"। কিন্তু "হুং" শব্দ কোন্ দেবতাকে লক্ষ্য করে তাহা বলা কঠিন। খুব সম্ভব মহাদেবের পত্নী দুর্গাকে, যাঁহার অসংখ্য নাম। "মণি পদ্মে" এই দুইটি শব্দ বাকী রহিল। মণি শব্দের অর্থ রত্ন। মণি পদ্মে শব্দের অর্থ পদ্মে অবস্থিত মণি বা রত্ন। 'ওঁ মণি পদ্মে হুং' এর অর্থ "রক্তপদ্মে অবস্থিত তুমি যে রত্ন"। রক্তপদ্ম আবার অবলোকিতেশ্বরের মণ্ডলের চিহ্নবিশেষ (Attribute)। যাঁহারা সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞ তাঁহারা জানেন যে সমস্ত মন্ত্রের যথাযথ অনুবাদ অসম্ভব।

মণি শব্দ সম্বোধনে ব্যবহৃত হয় নাই, এবং এই যে ষড়ক্ষরী মন্ত্র ঠিক ব্যাকরণের অনুগত করিয়া রচিত হয় নাই। মণিপদ্মে একটি যুগ্মপদ এইরূপ ধরিয়া লইতে হইবে। উইল্‌সন সাহেব বলেন যে মণি পানি একই কথা। পদ্মপানি শব্দের অর্থ যাহার হস্তে পদ্ম রহিয়াছে। পদ্মপানি শব্দে অবলোকিতেশ্বরকেই বুঝায়। এইরূপ মন্ত্র প্রায়ই সম্বোধনে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মণিপদ্মে, মণিপদ্মা এই শব্দের সম্বোধনের রূপ। F. W. Thomas সাহেব বলেন যে এই ষড়ক্ষরী মন্ত্র তারা দেবীর উদ্দেশে রচিত। এই তারা দেবী অবলোকিতেশ্বরের শক্তি ; এবং এই তারা দেবী অনেক স্থলে অবলোকিতেশ্বরের সহিত একত্র চিত্রিত ও পূজিত হইয়া থাকেন। ঐ ষড়ক্ষরী মন্ত্রের এইরূপ অর্থও করা যাইতে পারে "আপনি—পদ্ম যাহার মণি" অথবা "আপনি—যাহার পদ্মে মণি অবস্থিত"; ইহার প্রথম অর্থটি বিশেষ সুখবোধ্য নহে, দ্বিতীয়টি ঐ মন্ত্রের প্রকৃত অর্থ বলিয়া মনে হয়। Koeppen বলেন যে মণি শব্দে লিঙ্গ বুঝায় এবং পদ্ম শব্দে যোনি বুঝায়। এমতে মণিপদ্মে একটি স্ত্রী দেবী—যাঁহার যোনিতে লিঙ্গ রহিয়াছে। এইরূপ পরস্পরের মিলন অনেক স্থলেই দেখা যায়। বোধিসত্ত্ব ও তাঁহার শক্তি এই ভাবেই চিত্রিত। এই যে শক্তি—ইহা হইতে সমস্ত জগত বিকশিত, এবং এই শক্তিই আবার তাহার সন্তান বোধিসত্ত্বের সহিত সংমিলিত। ইহাই আবার নিবৃত্তিতে ও পরে নির্ব্বাণে লইয়া যায়।

যাহারা বিশ্বাসী তাহারা এই মন্ত্র জপ করে। যে শক্তিতে এই বিশ্ব ভ্রাম্যমাণ এই মন্ত্রের সাহায্যে উদ্বুদ্ধ হইয়া সেই শক্তির কণামাত্র লাভ নিজের ভিতরে উপলব্ধি করিয়া সাধক আপনার চরম লক্ষ্যের

দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। এই শক্তির নাম তারা। এই তারা নানা মূর্ত্তিতে চিত্রিত। "হুং" এই কথাটি তারার বীজমন্ত্ররূপে কখন কখন ব্যবহৃত হয়। রক্তপদ্ম বা জপমালা (বা অক্ষসূত্র—Rosary) যাহা ষড়ক্ষরীর চিত্রে দেখা যায়, তাহা কারণ্ডব্যূহ মতে প্রজ্ঞাপারমিতাকে বুঝায়। বোধিসত্ত্বের এই যে শক্তি—তাহা চিরন্তন পারমিতারই বিকাশ এবং তাহা তারা নামেই পরিচিত।

এই শক্তি ও শক্তিমানের ভাব ভারতীয় প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে শক্তি ও শক্তিমানের ভিতর দিয়া আর্য্যগণের চিন্তার ধারা চলিয়াছিল। শৈবধর্ম্মের ভিতরে এই ভাবের সমধিক বিকাশ। অবলোকিতেশ্বরের মূর্ত্তিকল্পনার ভিতরেও তাই শৈবধর্ম্মের ছায়া বহুল পরিমাণে পরিদৃষ্ট হয়। এই ষড়ক্ষরী মন্ত্র তাই প্রথম হইতে বৌদ্ধধর্ম্মের নিজস্ব বলিয়া মনে হয় না। এই ষড়ক্ষরী মন্ত্র হইতে বুঝা যায় যে বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত শক্তি কল্পনার ঘনিষ্ঠতম সম্বন্ধ অনেক দিন হইতে চলিয়া আসিয়াছে। এই পুরুষ অবলোকিতেশ্বর আবার চীনদেশে স্ত্রীরূপিণী কোয়ান্-ইন (Kwan-yin)। এ ভাব ভারতবর্ষেই প্রথম অঙ্কুরিত হইয়াছিল।

বিলাস।

(৺হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর)

এ বিপুল বিলাসের মাঝে
তাঁহার সঙ্গীত নাহি বাজে।
কি মোহে ভুলেছ বিশ্বরাজে—
কি মোহে ভুলেছ তাঁর কাজে?
এখন বিলাস কুতূহলে
আমোদ-প্রমোদ বেশ চলে—
স্ফূর্ত্তি বেশ বিলাসের বলে;
পরে ফাঁস পড়িবে গো গলে।
এ বিলাস বৃথা দাও ছাড়ি';—
জান না এর নক্ষত্র-নাড়ী।
এরে যদি না ফেল উপাড়ি'
এ তোমার সব লবে কাড়ি'—
এ বিলাস-মোহ ফেল ঝাড়ি'।

পুরুষ (সাংখ্যমতে)।

(শ্রীগোরীনাথ চক্রবর্ত্তী শাস্ত্রী)

পুরুষ ও প্রকৃতি এই দুইটি সাংখ্যদর্শনের মূল সূত্র। পুরুষ কে? প্রকৃতি কে? এই মহৎ তত্ত্ব সরলভাবে বুঝাইয়া দেয় এরূপ গ্রন্থ একখানিও দেখিতে পাওয়া যায় না। "প্রকৃতিঃ কর্ত্রী পুরুষঃ পুষ্করপলাশবৎ নির্লেপঃ" এইরূপ ব্যাখ্যা অনেক আছে; কিন্তু তদ্বারা পুরুষ ও প্রকৃতি বিষয়ে ধারণা হওয়া সহজ নহে। প্রাচীনকালে এই সকল তত্ত্ব শিষ্যপরম্পরায় মুখে মুখে চলিয়া আসিত—সূত্রগুলি স্মারকবাক্য মাত্র ছিল। সেই শিষ্যপরম্পরা-সম্প্রদায় আর এখন নাই। কাজেই প্রাঞ্জল গ্রন্থের আবশ্যক হইয়াছে। শুধু সাংখ্যের নহে সমস্ত দর্শনশাস্ত্রের জন্যেই ঐরূপ গ্রন্থের আবশ্যক আছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি টিপ্পনীকারদের গ্রন্থ আমাদিগকে কোন সাহায্য করিতে পারে না। তাঁহারা বিষয়টাকে সরল করা দূরে থাকুক আরও কঠিন করিয়া তুলিয়াছেন। প্রমাণ লইয়াই তাঁহারা ব্যগ্র ছিলেন, প্রমেয়ের দিকে ততটা দৃষ্টি রাখেন নাই।

পুরুষ যেমন নিষ্ক্রিয় তেমনি আবার নির্লেপ—কাহারও সঙ্গে মিশ খায় না; অথচ মিশখাওয়ার মত দেখা যায়। কাঁচের পাত্রে জবাফুল রাখিলে পাত্রটি লাল দেখায়; কিন্তু সত্যসত্যই পাত্রের গায়ে জবাফুলের রং লাগে না। প্রকৃতির সঙ্গে পুরুষের মিশ খাওয়াও সেইরূপ। পুরুষের ধর্ম্ম চৈতন্য। পুরুষকে বুঝিতে হইলে প্রথমতঃ ঐ ধর্ম্মটিকে বুঝা আবশ্যক। চৈতন্য কি বস্তু? চৈতন্যকে দেখা যায় না। আমাদের সমগ্র দেহটিকে তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিলেও চৈতন্যকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। দশটি ইন্দ্রিয়,মন অথবা মস্তিষ্ক ইহারা কেহই চৈতন্য নহে। ইন্দ্রিয়গুলি চৈতন্যদ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া কার্য্য করে বটে কিন্তু তাহারা নিজে চৈতন্য নহে। চৈতন্য না থাকিলে ইহাদের কোন কার্য্যই চলিত না। আমরা যাহা প্রত্যক্ষ (ইন্দ্রিয়গোচর) করি তাহার মধ্যে খুঁজিলে আমরা চৈতন্যকে পাই না অথচ চৈতন্য বলিয়া যে একটা জিনিস আছে তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হয়। আমরা যেমন আছি ইহাতে কাহারও ভুল নাই; চৈতন্যও তেমনি আছে ইহাতে ভুল নাই। ঘটে ঘটে যে চৈতন্য আছে—যে চৈতন্য তোমাতে আছে আমাতে আছে তাহাই পুরুষ, এইটুকু বলিলেও সাংখ্যের পুরুষকে ঠিক বুঝা যায় না। তাহাই যদি হইত তাহা হইলে সাংখ্যকার পুরুষ না বলিয়া শুধু চৈতন্যই বলিতেন। পক্ষান্তরে সাংখ্যদর্শন বলে যে "পুরুষঃ চেতনঃ"—অর্থাৎ চৈতন্যবিশিষ্ট। কাজেই দেখা যাইতেছে যে সাংখ্যকার শুধু চৈতন্যকে পুরুষ বলেন নাই, চৈত্যবিশিষ্ট কোন বস্তু বা ব্যক্তি

অভিপ্রেত। এই পুরুষ কে? তাহার স্বরূপই বা কি প্রকার? ইহাই সাংখ্যদর্শনের প্রথম আলোচ্য।

পুরুষের কোন ক্রিয়া নাই—নিষ্ক্রিয়, অথচ তিনি সকলকে প্রকাশ করিতেছেন। যাঁহার ক্রিয়া নাই তিনি কি প্রকারে প্রকাশ করিতেছেন? প্রকাশ করাও তো একটি কার্য্য? ইহার উত্তরে এই বলিতে হইবে যে তিনি আছেন বলিয়াই প্রকাশিত হয়—তিনি নিজে কিছু করেন না। দীপ জ্বলিতেছে, গৃহটি আলোকিত হইতেছে। দীপের সত্তা মাত্র—কোন ক্রিয়া নাই। চৈতন্যকে দেখা যায় না, অনুভব করা যায়। চৈতন্য নিরাকার। এই চৈতন্যই পুরুষের ধর্ম্ম বা স্বরূপ,সুতরাং পুরুষও নিরাকার। পুরুষও আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহেন—অনুভূতির বিষয়। চৈতন্য এবং তদ্ধর্ম্মী পুরুষ কোন একটি সীমাবদ্ধ স্থান বা কাল অধিকার করিয়া নাই, সর্ব্বত্র এবং সকল সময়ে বর্ত্তমান আছেন; সুতরাং বলিতে হইবে যে পুরুষ অনাদি ও অনন্ত। সাংখ্যের পুরুষ একটি নহে—বহু। তাঁহাদের সংখ্যাও অনন্ত। যদিও সাংখ্যকার পুরুষগণের সংখ্যা বহু বলিয়াছেন, পরবর্ত্তী দর্শনগুলির আলোচনা দ্বারা বুঝা যায় যে, ঐ বহুসংখ্যক পুরুষ এক অদ্বিতীয় পুরুষেরই বহুধা বিকাশ। যেমন বৈদিক ঋষিগণ এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মেরই বহুধা বিকাশ ভিন্ন ভিন্ন শক্তিসাপেক্ষ ভিন্ন ভিন্ন দেবতাদিগকে পূজা করিতেন, অথচ তাঁহারা জানিতেন যে ঐ দেবতাগুলি প্রত্যেকে সেই ভূমা অনন্য ব্রহ্ম—তাঁহার অংশ নহে, তাঁহারই একভাবে প্রকাশ। সাংখ্যের পুরুষগণও সেইরূপ। বেদের পরে উপনিষদ যেমন বিবিধ শক্তিসম্পন্ন দেবতাগুলিকে এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মে পর্য্যবসিত করিয়াছে, সাংখ্যের পরবর্ত্তী দর্শনগুলিও সেইরূপ অনন্ত পুরুষগুলিকে এক অদ্বিতীয় অনন্ত পুরুষ, আত্মা বা ব্রহ্মে পর্য্যবসিত করিয়াছে। তাই বেদব্যাস বলিয়াছেন,—

"সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্‌বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ।"

পুরুষের দুইটি অবস্থা—বদ্ধ এবং মুক্ত। সংসারে আবদ্ধ পুরুষ বদ্ধ। সংসারে আবদ্ধ হইয়া মুক্ত পুরুষ কি প্রকারে বদ্ধ হয় তাহা পরে বলা হইবে। অসংসারী পুরুষ মুক্ত। মুক্ত পুরুষ সকল প্রকার দুঃখ হইতে মুক্ত তিনি সকল প্রকারে দুঃখহীন। এই পর্য্যন্তই আমরা সাংখ্যে পাই; আর তিনি যে চিৎস্বরূপ তাহাও পাই, কেন না তিনি চৈতন্য। কিন্তু তিনি যে আনন্দস্বরূপ স্পষ্টরূপে তাহার কোথাও উল্লেখ নাই। দুঃখমুক্ত এক কথা আর আনন্দস্বরূপ অন্য কথা। কেবল দুঃখমুক্ত হইলে আনন্দস্বরূপ হয় না। আরও চাই। হাওয়া নাই—প্রদীপটি শান্তিতে জ্বলিতেছে, কিন্তু প্রদীপ যে নিজে উজ্জ্বল ও আলোকময়, শুধু হাওয়ামুক্ত এই কথাটি দ্বারা তাহা বুঝা যায় না; পুরুষের আনন্দময়ত্ব পরবর্ত্তী দার্শনিকগণ বুঝাইয়াছেন।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে পুরুষ একজন ব্যক্তি। কেহ যেন মনে না করেন, পুরুষ সূর্য্যাদির মত প্রকাশক একটা জড়পিণ্ড। পুরুষকে বুঝা বড় কঠিন নহে—সকলের ভিতরেই আছেন। সম্পূর্ণভাবে না হউক আংশিক ভাবে সকলেই বুঝিতে পারিবেন। বুদ্ধি, অহঙ্কার (আমিজ্ঞান), মন, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও সমস্ত দেহটি, এই সকল বাদ দিলে আমাদের যাহা কিছু অবশিষ্ট থাকে তাহাই পুরুষ। তাঁহারই পার্শ্বে কার্য্যকারিণী শক্তি প্রকৃতি। উপরিউক্ত পদার্থকয়টি বাদ দিলে কি আমাদের আর কিছু থাকে না? কে ইহা বলিতে পারে যে থাকে না? কর্ত্তা কে? এগুলি ত করণ? এগুলি আর একজনের হাতে পরিচালিত হয়। যাঁহার হাতে পরিচালিত হয় তিনিই প্রকৃতিসম্বলিত পুরুষ। তিনি জীবিত চৈতন্যময়,—জড়পিণ্ড নহেন।

যাহা বলা হইল বোধ হয় পুরুষকে বুঝিবার জন্য তাহাই যথেষ্ট হইবে। এক্ষণে আমরা প্রকৃতির সম্বন্ধে আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইব।

ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি।

বন্ধু।

ধানী—কহরবা।

বন্ধু মোর চক্ষে তোমার আঁখ্ মিলালে কেন নাহি?
কোন্ বা দোষে দোষী হায়, প্রেমদৃষ্টি কেন দিলে নাহি?
প্রাণের মোর নাথ্ কত দুখভার বহিব মম শকতি নাহি।
দুখের অনলে তুমি ঢালিয়া জল দাও—তোমারি জয়গান্ হে গাহি॥

বাঙ্গালা গানের কথা—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর
হিন্দী গান ও সুর—নবাব ওআজেদ আলি শাহ্।
স্বরলিপি—শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

আস্থায়ী।

১´ ॰ ১´ ॰
{ জ্ঞপা মা -া মা। জ্ঞা -া জ্ঞা মা। রা -া -া জ্ঞা। রা -া সা -া।
বাংলা গান—ব॰ ॰ ॰ন্ধু মো ॰ র ॰ চ ॰ ॰ক্ষে তো ॰ মা র্
হিন্দী গান—দো॰ ॰ ॰ স্ত মে ॰ রা ॰ দিল্ ॰ ॰ সে আপ্ ॰ না ॰

১´ ॰ ১´ ॰
রা মা -া মা। পা -া পা -া। পা পা -া দা। দপা মজ্ঞা রা জ্ঞা }
আঁ ॰ থ্ মি লা ॰ লে ॰ কে ন ॰ না হি॰ ॰॰ ॰ ॰
দি ॰ ল্ মি লা ॰ তে ॰ কেঁ ও ॰ না হি॰ ॰॰ ॰ ॰

১´ ॰ ১´ ॰
{ মা পা -া পা। পা -া র্সা -া। ধা র্সা -া ণা। ধা -া পা পা। }
কো ॰ ন্ বা দো ॰ ষে ॰ দো ॰ ॰ ষী হা য়্ প্রে ম
ম ॰ য়্ তে তে ॰ রা ॰ দো ॰ ॰ স্ত হ্যা য়্ তু ম

১´ ॰ ১´ ॰
পা দা মা পা। মা জ্ঞা রা জ্ঞা। মা -া -া পা। দপা মজ্ঞা রা জ্ঞা।
দৃ ॰ ষ্টি ॰ কে ন ॰ দি লে ॰ ॰ না হি॰ ॰॰ ॰ ॰
কা ॰ হে ॰ নে হ ॰ ল গা ॰ ॰ না হি॰ ॰॰ ॰ ॰

অন্তরা।

১´ ॰ ১´ ॰
{ মা -া পা পা। না -া না না। র্সা -া র্সা -া। র্সা র্সা র্সা -া।
প্রা ॰ ণে র মো র্ না থ্ ক ॰ ত ॰ দু খ ভা র্
আ ॰ গ র্ হ র্ দ ম্ তু ॰ ম ॰ দু খ দি ল্

১´ ॰ ১´ ॰
ধর্সা -া ণা -া। ধা -া ধা ধা। ধণা র্সণা ধণা ধা। পা -া -া -া
ব॰ ॰ হি ॰ ব ॰ ম ম শক্ তি॰ ॰॰ না হি ॰ ॰ ॰
মে॰ ॰ না ॰ য়ে ॰ ক্যা হো সক্ তা॰ ॰॰ নে হি ॰ ॰ ॰

১´ ॰ ১´ ॰
মা ধা ধা ধা। ধা ণা র্রা র্সা। ধা র্সা ণা ণা। ধা ণা ধা পা।
দু খে র অ ন লে তু মি ঢা ॰ লি য়া জ ল দা ও
দু খ অ ন ল কে তু ম পা ॰ ণি মে ভা র্ দে ॰

১´ ॰ ১´ ॰
মা মা -া মা। পা পা পা -া। পা -া -া দা। দপা মজ্ঞা রা জ্ঞা॥
তো মা ॰ রি জ য় গা ন্ হে ॰ ॰ গা হি॰ ॰॰ ॰ ॰
পা ণি ॰ মা ফি ক্ দি ল্ হো ॰ ॰ র হি॰ ॰॰ ॰ ॰